দিলেন। হুর তার সেনা বাহিনীসহ হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র সাথে সাথে চলতে শুরু করল।

এই সময় হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' শত্রু মিত্র সকলকে উদ্দেশ্য করে নসীহত সম্বলিত একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দিলেন। ভাষণে তিনি কূফার সার্বিক পরিস্থিতি তুলে ধরে ইয়াযীদ ও তার শাসক গোষ্ঠির অন্যায় ও জুলুমের চিত্র তুলে সকলকে সত্য ও ন্যায়ের পথে অগ্রসর হওয়ার আহ্বান জানালেন।

হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র ভাষণ শুনে হুর ইবনে ইয়াযীদ বলল- 'আমি আপনাকে খোদার দোহাই দিয়ে বলছি, আপনি আপনার জীবনকে বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিবেন না। কারণ আমার প্রবল আশংকা হচ্ছে, আপনি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে আপনাকে শহীদ করা হবে।'

হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' রাগত স্বরে বললেন, তুমি আমাকে মৃত্যুর ভয় দেখাচ্ছ? তোমরা কি আমাকে হত্যার হুমকি দিচ্ছ?'

হুর ইবনে ইয়াযীদের অন্তরে নবী-পরিবার তথা আহলে বাইতের সম্মান আর শ্রদ্ধা ছিল পরিপূর্ণ। সে আর কথা না বাড়িয়ে পৃথক হয়ে গিয়ে দূর থেকেই হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র অনুসরণ করতে লাগল।

এদিকে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র সহযোগিতার জন্য 'তারাম্মাহ ইবনে 'আদী'র নেতৃত্বে চার সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল এসে কাফেলার সাথে শরীক হল। হুর ইবনে ইয়াযীদ প্রথমে তাদের বাধা দেয়ার চেষ্টা করলেও হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র হুমকীর মুখে হুর তাদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হল। হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' তাদের কাছে কূফাবাসীর অবস্থা জানতে চাইলে, তারা জানাল-

'সরকারী কোষাগারের অর্থ দিয়ে শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের ইবনে যিয়াদ কিনে নিয়েছে। এখন তারা আপনার প্রতিপক্ষের সহযোগিতা করতে সংকল্পবদ্ধ। জন সাধারণের অন্তরে আপনার ভালবাসা থাকলেও তাদের তরবারী আপনার বিরুদ্ধেই কথা বলবে। আমরা আসার সময়ও আপনার বিরুদ্ধে মুকাবিলা করার জন্য অনেক লোককে প্রস্তুতি নিতে দেখে এসেছি। কারো মুকাবিলায় ইতিপূর্বে এত অধিক সংখ্যক লোক আমরা কখনো দেখিনি।

খোদার কসম! আপনি আর এক পা সামনে অগ্রসর হবেন না। আপনি আমাদের সঙ্গে চলুন। আমরা আপনাকে 'আযা' নামক পর্বতমালায় নিয়ে যাব। সেখানে আপনি সংরক্ষিত কিল্লার ভিতর বসবাস করতে পারবেন। শত্রুরা আপনার নাগাল পাওয়ার কল্পনাও করতে পারবে না। শত্রুর হামলা রুখতে আমরা সাধারণতঃ এই পাহাড়কেই ব্যবহার করে থাকি। এখানেই আশ্রয় নিয়ে থাকি। আপনি সেখানে অবস্থান করে 'তাই' গোত্রের লোকদের সমবেত হওয়ার আহ্বান করুন। খোদার শপথ! দশদিন অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই এ গোত্রের লোকেরা সর্বান্তকরণে আপনার সাহায্যে এগিয়ে আসবে। তখন যদি আপনি বর্তমান সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন, তবে আমরা আপনাকে বিশ হাজার সাহসী বীর যোদ্ধা যুগিয়ে দেয়ার দায়িত্ব নিচ্ছি। বীরত্বের নিপুণতা প্রদর্শন করে তারা আপনাকে মুগ্ধ করে দিবে। দেহে প্রাণ থাকা পর্যন্ত তারা আপনার গায়ে সামান্য আচড় দেয়ার সুযোগও শত্রুপক্ষকে দিবে না।'

হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' বললেন- 'আল্লাহ তোমাদের গোত্রের লোকদের মঙ্গল করুন। যেহেতু আমার এবং হুর ইবনে ইয়াযীদের মাঝে একটি চুক্তি হয়েছে। তাই আমার পক্ষে এই চুক্তি ভঙ্গ করা সম্ভব হবে না। আমাদের শেষ পরিণাম সম্পর্কে এখনো আমি কিছুই বলতে পারছি না।'

এ কথা শুনে তারাম্মাহ ইবনে 'আ'দী সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে পুনরায় হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র কাফেলার সাথে যোগ দেয়ার ওয়াদা করে বিদায় নিল। পরবর্তীতে ওয়াদা মুতাবেক সে এসেছিল। কিন্তু হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র মিথ্যা শাহাদাতের সংবাদ শুনে ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে ফিরে গিয়েছিল।

এমনি পরিস্থিতির ভিতর একদিন হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' হঠাৎ তন্দ্রা থেকে জেগেই বলে উঠলেন- 'ইন্নালিল্লাহ!' এ সময় তাঁর পাশেই ছিলেন ছেলে আলী আকবর। তিনি হতবুদ্ধি হয়ে জিজ্ঞেস করলেন- 'আব্বাজান! আমাদের জন্য কি কোন দুঃসংবাদ আছে?'

হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' বললেন- 'আমি স্বপ্নে দেখতে পেলাম, একজন অশ্বারোহী দ্রুতগতিতে আমার দিকে ছুটে আসছে, আর

বলছে– 'কিছু লোক সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে এবং তাদের মৃত্যুও তাদের সাথে সাথেই অগ্রসর হচ্ছে।' এতে আমি এই বুঝেছি যে, আমাদের মৃত্যু অতি নিকটে।'

আলী আকবর বললেন– 'আব্বাজান! আমরা কি তবে সত্যের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত নই?' হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' বললেন– 'মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ'র শপথ! নিঃসন্দেহে আমরা সত্যের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত।'

তা শুনে আলী আকবর বললেন– 'তবে আর আমাদের ভয়ের কি কারণ থাকতে পারে? সত্যের পথে থেকে শাহাদাত বরণের চেয়ে সৌভাগ্য আর কি হতে পারে?'

হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' ছেলের সৎ সাহসের প্রশংসা করে বললেন– 'আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। তুমি তোমার পিতার পরিপূর্ণ হক্ব আদায় করতে সক্ষম হয়েছ।' (১)
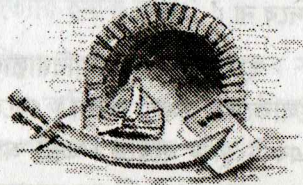
কারবালার ময়দানে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'

হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে 'নাইনুবী' নামক স্থানে যখন পৌছলেন। তখন কূফা থেকে একজন অশ্বারোহী খুব দ্রুতগতিতে এসে হুর ইবনে ইয়াযীদকে সালাম করল। হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র প্রতি সামান্যতম ভ্রূক্ষেপ পর্যন্ত করার প্রয়োজনটুকু সে অনুভব করল না। সে হুরের নিকট ইবনে যিয়াদের একটি পত্র হস্তান্তর করল। যার বিষয় বস্তু ছিল এমন–

'এ পত্র তোমার হস্তগত হওয়ার সাথে সাথে হুসাইনের চলার গতি সংকীর্ণ করে দিবে। খোলা মরুভূমি, যেখানে পানির কোন ব্যবস্থা থাকবে না, এমন স্থান ছাড়া তাকে কোথাও শিবির স্থাপনের সুযোগ দিবে না। আমার

(১) আল-কামেল লি-ইবনে আছীর, খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা-২৭৯-২৮২
তারীখে তাবরী, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩০১-৩০৮
আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা-১৭২-১৭৪

নির্দেশ পুরোপুরি বাস্তবায়িত হওয়ার আগ পর্যন্ত পত্রবাহক তোমার সাথেই থাকবে। সে তোমার গতি-বিধির উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখবে।'

হুর কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় ইবনে যিয়াদের পত্রের বিষয়বস্তু সম্পর্কে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'কে অবগত করানোর পর নিজের অপারগতা প্রকাশ করে বলল–

'এখন আমার পিছনে গুপ্তচর লেগে আছে। আপনার সাথে নম্র ও ভদ্র ব্যবহারের অবকাশ আর আমি পাব না।'

এ সময় হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'কে উদ্দেশ্য করে তাঁর এক সাথী বললেন–

'আপনি দেখছেন, প্রতিটি মুহূর্তে আমাদের সমস্যা শুধু বেড়েই চলছে। এমন পরিস্থিতিতে এই এক হাজার সৈন্যের সাথে যুদ্ধ শুরু করে দেয়াটাই কি আমাদের জন্য ভাল হত না?'

হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' বললেন– 'আমি চাইনা আমার দ্বারা যুদ্ধের সূচনা হোক।'

সঙ্গী বলল– 'যদি তা নাই চান, তবে আমাদেরকে নিয়ে সামনে ফোরাত নদীর তীরে ঐ বস্তিতে চলুন। বস্তিটি আমাদের আত্মরক্ষার জন্য সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। তারা যদি আমাদের সে স্থানে যেতে বাধা দেয়ার চেষ্টা করে, তখন আমরা তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হব।'

হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' বস্তিটির নাম জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন যে, তার নাম 'আকর'। নাম শুনার সাথে সাথে বললেন– আমি 'আকর' থেকে পানাহ্ চাই। (আকর-এর শাব্দিক অর্থ হল, ধ্বংস।)

হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' এ বিষয় নিয়ে সাথী-সঙ্গীদের সাথে আলোচনা করছিলেন। এমন সময় উমর ইবনে সা'আদের নেতৃত্বে চার হাজার সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী যুদ্ধের জন্য উপস্থিত হল। উমর ইবনে সা'আদ হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারছিলেন না। সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায় ইবনে যিয়াদ তাকে এক

প্রকার জোর করেই এ কাজে প্রেরণ করেছে। আন্তরিকভাবেই তিনি সব সময় চাচ্ছিলেন, হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব যেন তার কাঁধে না বর্তায়। এ বিপদ থেকে তিনি মুক্ত থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করা সত্ত্বেও ইবনে যিয়াদ তার কোন আপত্তিই কানে তুলেনি।

উমর ইবনে সা'আদ এখানে পৌছে প্রথমে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' তার কূফায় আগমনের উদ্দেশ্য জানতে চাইলে তিনি কূফায় আগমনের পুরা প্রেক্ষাপট তুলে ধরে বললেন–

'আমি স্বেচ্ছায় এখানে আগমন করিনি । এখানে আসার জন্য আমাকে অনুরোধ জানান হয়েছে। এখন যদি অবস্থার পরিবর্তন হয়ে থাকে, তবে আমি ফিরে যেতে প্রস্তুত রয়েছি।'

উমর ইবনে সা'আদ তৎক্ষণাৎ ইবনে যিয়াদের নিকট পত্র লিখে পাঠালেন যে– 'হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' পুনরায় মক্কা প্রত্যাবর্তন করতে রাজী আছেন।'

তার পত্রের উত্তরে ইবনে যিয়াদ লিখে পাঠাল যে– 'হুসাইনের জন্য এখন কেবলমাত্র একটি পথই খোলা আছে। আর সেটি হল– ইয়াযীদের হাতে বাই'আত গ্রহণ করা। যদি হুসাইন ('রাযিয়াল্লাহু আনহু') ইয়াযীদের হাতে বাই'আত নিতে সম্মতি জানায়, তবে আমরা ভেবে দেখব পরবর্তীতে তাঁর সাথে কি আচরণ করা যায়।' ইবনে যিয়াদ পত্রে আরও লিখে দিল যে– 'হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' এবং তাঁর সাথী সংগীরা পানি থেকে যেন পুরোপুরি বঞ্চিত থাকে।'

তখন মুহররম মাসের ৭ তারিখ। ইবনে যিয়াদের উত্তর পেয়ে উমর ইবনে সা'আদ নিরাশ হয়ে গেলেন এবং নির্দেশ মুতাবেক হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' ও তাঁর সাথী-সংগীদের থেকে পানি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিলেন। হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' তাদের এ ব্যবহারে ভীষন আঘাত পেলেন।

এক সময় কাফেলার প্রত্যেকের জমান পানি নিঃশেষ হয়ে গেল। তরুলতা বিহীন আরব মরুভূমি, উপরন্ত সুর্যের প্রখর তাপে পানির তৃষ্ণায়

ছোট ছোট শিশু-বাচ্চারা ছটফট করতে লাগল। হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় নিজের ভাই আব্বাছ ইবনে আলী'কে ত্রিশজন অশ্বারোহী এবং ত্রিশজন পদাতিকের এক বাহিনী সাথে দিয়ে ফোরাত থেকে পানি আনতে পাঠালেন। উমর ইবনে সা'আদের সৈন্য বাহিনীর সাথে তুমূল সংঘর্ষ করে শেষ পর্যন্ত বিশ মশক পানি সংগ্রহ করতে সক্ষম হলেন।

অতঃপর হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' উমর ইবনে সাআদের সাথে সাক্ষাতে আলোচনার জন্য পয়গাম পাঠালেন। পয়গামে তিনি এও জানিয়ে দিলেন– 'আজ রাতের মধ্যেই আমাদের একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে। কালক্ষেপনে উভয় পক্ষেরই লোকসান।'

পয়গাম মুতাবেক রাতের বেলায় উমর ইবনে সা'আদ হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র সাথে মিলিত হলেন। হযরত হুসাইন এবং উমর ইবনে সা'আদ-এর মাঝে সুদীর্ঘ আলোচনার পর হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' উমর ইবনে সা'আদের নিকট তিনটি প্রস্তাব পেশ করেন। প্রস্তাব তিনটি ছিল নিম্নরূপ–

একঃ– যে স্থান থেকে এসেছি সে স্থানে ফিরে যাওয়ার সুযোগ আমাকে দেয়া হোক। অথবা

দুইঃ– সরাসরি ইয়াযীদের সাথে আমার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা হোক। অথবা-

তিনঃ– আমাকে যে কোন মুসলিম রাষ্ট্রে চলে যাওয়ার সুযোগ দেয়া হোক। সেখানকার সর্ব সাধারণ আমাকে যেভাবেই গ্রহণ করবে, আমি তাদের সাথে সেভাবেই বসবাস করব ।

হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র এ প্রস্তাবের কথা উল্লেখ করে উমর ইবনে সা'আদ একটি পত্র পঠিয়ে দিলেন ইবনে যিয়াদের নিকট। পত্রের বিষয় বস্তু ছিলো–

'আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের পরস্পরের মাঝে যুদ্ধের ডামাডোল থামিয়ে দিয়েছেন। মুসলমানদের ভিতর আবার ঐক্য প্রতিষ্ঠার সমূহ সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এই চরম সংকটময় মুহূর্তে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'

আমাদের সামনে তিনটি প্রস্তাব পেশ করেছেন। এর যে কোন একটি অবলম্বনের মাধ্যমে আমাদের সমস্যার সহজ সমাধান সম্ভব। যার ফলে মুসলমানরা মান-মর্যাদার সাথে শান্তিপূর্ণভাবে জীবন যাপন করতে পারবে।'

উমর ইবনে সা'আদের পত্র ইবনে যিয়াদের উপর অনেকটা প্রভাব ফেলতে সক্ষম হল। সে বলল- এই পত্র এমন এক ব্যক্তির, যে নেতার আনুগত্য স্বীকার করে জাতির ভিতর ঐক্যের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। সমস্ত দিক বিবেচনা করে আমি তার এ প্রস্তাবকে অনুমোদনের সিদ্ধান্ত নিলাম।

কিন্তু বিধি হল বাম। এই শুভ মুহূর্তে শিমার ইবনে ঝিল-জাওশাসন এই ঐক্য প্রচেষ্টার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল। প্রস্তাবটি অনুমোদনের ঘোর বিরোধিতা করে সে বলল-

'হুসাইনকে হাতের মুঠোয় পেয়ে ছেড়ে দেয়া বা সুযোগ দেয়া কোনটাই ঠিক হচ্ছে না। পরিণতিতে আমাদের জন্য ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টির সম্ভাবনা খুবই প্রকট। আজ তার অর্থ ও জনবল কম। কিন্তু সুযোগ পেলে দু'দিন পর সে শক্তি অর্জন করে আপনার বিরুদ্ধেই যুদ্ধ ঘোষণা করবে। তখন তার সাথে কুলিয়ে উঠা আপনার সাধ্যের বাইরে চলে যাবে। তাই সময় থাকতে সতর্কতার সাথে পদক্ষেপ নেয়ার আরজি পেশ করছি। আমি শুনেছি রাতের অন্ধকারে উমর ইবনে সা'আদ ও হুসাইন (রাঃ)-এর মাঝে গোপন বৈঠক চলে। আমার বিশ্বাস তারা উভয়ে হাত মিলিয়ে আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছে। অতএব আপনি এ প্রস্তাব অনুমোদন না করে যে কোন উপায়ে হুসাইন (রাঃ)-কে আপনার নিকট উপস্থিত হতে বাধ্য করুন। তারপর তাকে শাস্তি দেয়া বা ক্ষমা করে দেয়ার কথা বিবেচনা করা যাবে। অন্যথায় পরে আপনাকে এজন্য চরম মাশুল দিতে হবে।

শিমারের প্ররোচনায় ইবনে যিয়াদের মন বিগড়ে গেল। তাই সে শিমারের পরামর্শ মত উমর ইবনে সা'আদের নিকট এই মর্মে পত্র প্রেরণ করল-

'আমি তোমাকে যুদ্ধ এড়িয়ে নতুন কোন পন্থা অবলম্বন করে হুসাইন (রাঃ)-এর জন্য সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিনি। কিংবা আমি তোমাকে এজন্য পাঠাইনি যে, তুমি হুসাইন (রাঃ)-এর পক্ষ নিয়ে তার হয়ে আমার

কাছে সুপারিশ পেশ করবে। তার সঙ্গীরা যদি আমার সাথে কোন চুক্তিতে আসতে চায় অথবা সাক্ষাতে আমার সাথে কথা বলতে চায়, তবে তাদেরকে নিরাপত্তার সাথে আমার নিকট পৌঁছে দিবে। আর যদি তারা আমার নিকট আসতে অস্বীকৃতি জানায়, তবে কালবিলম্ব না করে তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র চালাবে। যুদ্ধে তাদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করবে। অঙ্গ-প্রত্যাঙ্গ বিকৃতি সাধন করে (নাক কান কেটে) তোমাদের ঘোড়ার পায়ের নীচে তাদেরকে মাটির সাথে পীশে মারবে। এটাই শুধু তাদের প্রাপ্য। এমন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিরই তারা যোগ্য। আমার এ নির্দেশ যথাযথ পালন করতে পারলে অজস্র পুরস্কার তোমার জন্য অপেক্ষা করবে। আর যদি আমার এ নির্দেশ পালনে তোমার কোন ধরনের সংকট বা দ্বিধা থাকে, তবে পত্র প্রাপ্তির সাথে সাথেই তুমি সেনাপতির দায়িত্ব শিমারের হাতে অর্পণ করে সৈন্য থেকে পৃথক হয়ে যাবে।'

ইবনে যিয়াদ পত্রটি শিমারের মাধ্যমেই প্রেরণ করল। যাত্রার প্রাক্কালে শিমারের স্মরণ হল যে, হেযাযের কাফেলাটির সাথে তার কয়েকজন আত্মীয়-স্বজনও এসেছে। তাদের জীবন রক্ষার স্বার্থে সে ইবনে যিয়াদ থেকে তাদের জন্য নিরাপত্তানামা লিখিয়ে নিল। গন্তব্য স্থানে পৌঁছে প্রথমে সে নিরাপত্তানামাটি আত্মীয়দের কাছে হস্তান্তর করল। কিন্তু এই নিরাপত্তানামা দেখে ক্রোধে ক্ষোভে তাঁরা সমস্বরে বলে উঠলেন-

'আমাদের জীবন বাঁচাতে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এসেছ? তোমার লজ্জা থাকা উচিত যে, শুধু আত্মীয়দের বাঁচাতে তুমি যে নিরাপত্তানামা নিয়ে এসেছ,সেখানে তাদের নেতা, রাসূলুল্লাহ 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামে'র নয়নমণির নিরাপত্তার কোন কথা উল্লেখ নেই। ধিক! তোমার এই লাঞ্ছনাকর নিরাপত্তার। আল্লহর লা'নত তোমার উপর এবং এই অভিশপ্ত নিরাপত্তার উপর। তোমার নিরাপত্তার সামান্যতম প্রয়োজন আমাদের নেই। আমাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবেন শুধু আল্লহ'ই। অন্য কারো দেয়া নিরাপত্তায় আমরা বিশ্বাস করি না।'

শিমার পত্র নিয়ে যখন উমর ইবনে সা'আদের নিকট পৌঁছল। তখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, এসব কিছুই শিমারের চক্রান্তে সম্পাদিত হয়েছে। উমর ইবনে সা'আদ শিমারকে উদ্দেশ্য করে বললেন-

'শিমার! তুমি হয়ত ভাবতেও পারবে না যে, কত ভয়াবহ ও মারাত্মক একটি ক্ষতির দ্বার তুমি উন্মোচন করে দিলে। মুসলমানদের ভিতর কত বড় একটি ঐক্যের ভীতকে তুমি চুরমার করে দিলে এবং নতুন করে মুসলিম উম্মাহ'র মাঝে কলহ-দ্বন্দের আগুনকে উস্কে দিলে। নিশ্চিত হত্যাযজ্ঞের দিকে তাদের ঠেলে দিলে।'

অবশেষে যখন হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'কে ইবনে যিয়াদের এই নির্দেশ নামার কথা জানান হল, তখন তিনি ইবনে যিয়াদের প্রস্তাবকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে বললেন– 'এ অপমানের পূর্বে আমার মৃত্যু হওয়াই হবে উত্তম।' (১)

শাহাদাতের পূর্বের ঘটনা

মুহররমের নয় তারিখ যুদ্ধের দামামা বাজার অপেক্ষায় সবাই প্রহর গুনছে। হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় বসে বসেই ঝিমুচ্ছিলেন। এই ঝিমুনির মাঝেই তিনি হঠাৎ উচ্চস্বরে আওয়াজ করে উঠলেন। তার পাশেই বসা ছিলেন বোন যয়নব। আওয়াজ শুনে তিনি দৌড়ে এসে কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি জানালেন–

'এই মাত্র আমি নানাজানকে স্বপ্নে দেখেছি। তিনি আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন– 'হে হুসাইন! তুমি কিছুক্ষণের মাঝে আমার সাথে এসে শামিল হতে যাচ্ছ।'

এ কথা শুনে যয়নব কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' তাকে শান্তনা দিচ্ছিলেন। এমনি সময় শিমার তার সুসজ্জিত বাহিনী নিয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হল। হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র ভাই

---

(১) আল-কামেল লি- ইবনে আছীর, খণ্ড - ৮, পৃষ্ঠা -২৮২-২৮৪
আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়ী, খণ্ড - ৮, পৃষ্ঠা - ১৭৪ - ১৭৬
তারীখে তাবরী, খণ্ড -4, পৃষ্ঠা - ৩০৯ - ৩১৫

আব্বাস অগ্রসর হয়ে তাদের অভিপ্রায় জানতে চাইলে শিমার ঘোষণা করল– 'তোমাদেরকে আর সময় দেয়া হবে না। এখন থেকেই তোমাদের সাথে আমাদের যুদ্ধ শুরু হতে যাচ্ছে।'

হযরত আব্বাস এসে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'কে এ সংবাদ জানালে তিনি বললেন– 'তাদেরকে বল– আজ আমরা যুদ্ধ করতে প্রস্তুত নই। অন্ততঃ একদিনের জন্য হলেও যেন তারা যুদ্ধ পিছিয়ে দেয়। কারণ, অছিয়ত করতে ও নিজেদের গোনাহের জন্য আল্লাহ'র দরবারে কান্নাকাটি করতে আমাদের অন্ততঃ একটি রাতের প্রয়োজন। এই রাতে আমরা আল্লাহ'র নিকট ক্ষমা চেয়ে পাপ মুক্ত হতে চাই।'

শিমার এবং উমর ইবনে সা'আদ সাথীদের সাথে পরামর্শ করে সেদিনকার মত যুদ্ধ মুলতবী ঘোষণা করলে সৈন্যরা নিজ নিজ শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করল। এই সময় হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' আহলে বাইতসহ সকল সাথীদের একত্রিত করে এক ভাষণ দিলেন। সকলকে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন–

'হে আল্লাহ! তুমি নবীর বংশে জন্ম দিয়ে আমাকে যে মর্যাদার আসনে বসিয়েছ, তার শোকর আদায় করার ভাষা বা ক্ষমতা আমার নেই। তুমি আমাকে সুখে রাখ বা দুঃখে রাখ , সর্বাবস্থায় আমি আমার সাধ্যমত তোমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি। আমাদের উপর তোমার অসংখ্য করুণা । তুমি আমাদের চোখ, কান ও অন্তর দিয়েছ বলেই আমরা তোমার পবিত্র কালাম হৃদয়ঙ্গম করতে পারি। প্রভু হে! তুমি তোমার মনোনীত বান্দাদের কাতারে আমাদের শামিল করে নাও।' তার পর তিনি আরও বললেন–

'এই মুহূর্তে পৃথিবীর বুকে আমার সাথীদের চেয়ে অধিক আত্মত্যাগী কেউ আছে বলে আমার জানা নেই। আমি জানিনা বর্তমান সময়ে আমার পরিবার-পরিজনের মত এমন দুরাবস্থায় পৃথিবীর অন্য কোথাও কোন পরিবার সময় কাটাচ্ছে কিনা? হে আল্লাহ আজ যারা নিজেদের প্রাণের মায়া ও দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করে তোমার আওয়াজ পৃথিবীর বুকে বুলন্দ রাখার লক্ষ্যে আমার পক্ষ হয়ে অস্ত্র চালাতে প্রস্তুত, তাদের তুমি হিম্মত দাও, সাহস ও শক্তি দাও।

উত্তম প্রতিদানে তাদের কর তুমি পুরস্কৃত।

বন্ধুগণ! আমার মন বলছে, আগামী কালই তাদের সাথে আমাদের চূড়ান্ত ও শেষ ফায়সালা হয়ে যাবে। তাই আমি স্বেচ্ছায় ও খুশী মনে তোমাদের বলছি, পূর্ব আকাশে আগামী ভোরের সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বেই তোমরা এ স্থান ত্যাগ কর। নিজেদের ইচ্ছা মত নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাও। দিনের আলোতে সে সুযোগ আর তোমরা হয়ত পাবে না। আর যদি সম্ভব হয়, তাহলে তোমাদের সাথে আমার পরিবারের একজন করে সদস্যকে নিরাপদ দূরুত্বে সরিয়ে নিয়ে যাও। কারণ দুশমনরা শুধু আমাকেই চায়। আমাকে পেলে তারা তোমাদের দিকে ফিরেও তাকাবে না।'

হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র এই মর্মস্পর্শী ভাষণ শোনার পর সকলে একবাক্যে বলে উঠলেন– 'খোদার শপথ! নিজের জীবনের মায়াজালে আবদ্ধ হয়ে শত্রুর হাতে আপনাকে তুলে দিয়ে প্রাণ বাঁচানোর মত হীন, নিকৃষ্ট ও জঘন্য মানসিকতা আমাদের নেই। এমন লাঞ্ছনাকর জীবন নিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যু আমাদের কাছে অনেক শ্রেয়। এমনিভাবে জীবণ ধারনের সামান্যতম স্পৃহাও আমাদের নেই।'

এরপর হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' মুসলিম ইবনে আ'কীলের আত্মীয়-স্বজনের উদ্দেশ্যে বললেন– 'যথেষ্ট। তোমরা সকলে ফিরে যেতে পার। আমি খুশী মনেই তোমাদের চলে যাওয়ার অনুমতি দিচ্ছি।'

উত্তরে তারা বলল– 'যখন মানুষ আমাদের জিজ্ঞাসা করবে, রাসূলুল্লাহ 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামে'র কলিজার টুকরাসহ তাঁর পরিবারকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে তোমারা কি করে চলে আসলে? তখন আমরা তাদের কি বলব ? মুখ লুকানোর জায়গাও তো তখন আমরা খুঁজে পাব না। আপনার সাথে আমাদের ভাগ্য নির্ধারিণ হয়ে গেছে। আমারা জেনে শুনেই এই বিপদসংকুল পথে আপনার সঙ্গী হয়েছি। আমাদের শরীরে একফোটা রক্ত অবশিষ্ট থাকতে আমরা আপনাকে একা এখানে রেখে যাওয়ার কল্পনাও করতে পারি না। আমাদের দেহে প্রাণ থাকতে আপনার সামান্য ক্ষতিও সহ্য করব না। আপনার শরীরে শত্রুর সামান্য আঁচড়েরও আমরা বদলা নিব । বদলা

আমাদের নিতেই হবে।'

একে একে সবাই এই মত প্রকাশ করে মনের দৃঢ়তা প্রকাশ করল। এ সময় হযরত যয়নব ব্যথাতুর মন ও ব্যাকুল হৃদয়ে কান্না শুরু করলে তাঁকে উদ্দেশ্য করে হযরত হোসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' এই অছিয়ত করেন–

'আল্লাহ'র দোহাই দিয়ে আমি তোমাকে অছিয়ত করে যাচ্ছি, আমার শাহাদাতের পর শোকে মুহ্যমান হয়ে কাপড় ছিঁড়া, মাতম করা, উচ্চস্বরে কান্নাকাটি করার মত যাবতীয় শরীয়ত গর্হিত কাজ কঠোরভাবে বর্জন করবে।' (১)

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের সাথেই বলতে হয়। যারা আজ হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র আশেক বলে নিজেদের পরিচয় দিয়ে বেড়ায়। তাঁর প্রতি গভীর প্রেম ভালবাসার যারা দাবী করে। তারাই আজ এ সকল জঘন্য কাজগুলোকে দ্বীনের অঙ্গ মনে করে খুব ঘটা করে পালন করে যাচ্ছে। বস্তুতঃ তারা হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র সর্বশেষ অছিয়তের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রদর্শন করে যাচ্ছে। আফসোস হয় তাদের উপর, তাদের বোধ বুদ্ধির উপর, লজ্জায় মাথা নুয়ে আসে তাদের কার্যকলাপ দেখে।

এই অছিয়তের পর হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' সাথী-সঙ্গীদের নিয়ে আল্লাহ'র দরবারে দোয়া ও ইসতেগফারে মনোযোগী হলেন। আল্লাহ'র দরবারে কান্নাকাটির ভিতর দিয়েই তাঁরা মুহররমের নয় তারিখ দিবাগত রাত পুরোটাই কাটিয়ে দিলেন।

(১) আল-কামেল লি- ইবনে আছীর, খণ্ড - ৩, পৃষ্ঠা - ২৮৪ -১৮৬
তারীখে তাবরী, খণ্ড - ৪, পৃষ্ঠা- ৩১৫ - ৩১৯
আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, খণ্ড - ৮, পৃষ্ঠা - ১৭৬ -১৭৮
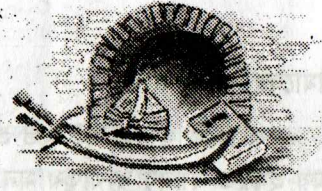
কারবালার রণাঙ্গণ

দশই মুহররম শুক্রবার মতান্তরে সোমবার ফজরের নামাযের পর উমর ইবনে সা'আদ সেনাবাহিনী নিয়ে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র মুখোমুখি হলেন। এ সময় হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র সাথে সর্বমোট সাথী-সঙ্গী ছিলেন বাহাত্তরজন। 'এদের মাঝে মাত্র বত্রিশজন ছিলেন অশ্বারোহী,বাকী সবাই পদাতিক। হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' সকলকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে দিলেন।

উমর ইবনে সা'আদ তাঁর সেনাবাহিনী চার ভাগে বিভক্ত করে প্রত্যেক দলের জন্য একজন করে সেনাপতি নিযুক্ত করেছিলেন। হুর ইবনে ইয়াযীদও একদলের সেনাপতি হয়ে যুদ্ধে নামল। হুর ইবনে ইয়াযীদের অন্তরে নবী বংশের প্রেম ভালবাসার অংকুর গজিয়ে ছিল পূর্ব থেকেই। তার বাধা দানের কারণে পরিস্থিতি এত ভয়াবহ আকার ধারণ করবে, এ কথা সে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। নবী পরিবারের বর্তমান দুর্দশার সমস্ত দোষের বোঝা নিজের কাঁধে চাপিয়ে কিঞ্চিৎ প্রতিকারের আশায় সে ঘোড়া চালিয়ে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র কাফেলার সাথে মিলে গেল। নিজের প্রাথমিক ত্রুটির জন্য হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র নিকট ক্ষমা চেয়ে বলল–

'আমি ভুলবশতঃ আপনার প্রত্যাবর্তনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। যার অশুভ পরিণতি আজ আমাকে দেখতে হচ্ছে। খোদার শপথ! আমি কখনও বুঝতে পারিনি, আপনার সাথে এহেন জঘন্য আচরণ করার দুঃসাহস এরা দেখাবে। আমি ভাবতেও পরিনি আপনার সকল প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করে এমন ভয়াবহ পরিস্থিতি তারা সৃষ্টি করবে। এমন হবে তার সামান্য আঁচও যদি আমি আগে করতে পারতাম, তাহলে আপনাকে আটকিয়ে রাখার মত বোকামী আমি কখনও করতাম না। জানি আমার এ ভুল শোধরানোর সময় আর নেই। তীর হাত থেকে ফস্‌কে গেছে। হাজারো প্রচেষ্টা করে দ্বিতীয়বার

তা ফিরিয়ে আনা অসম্ভব। তবে সামান্য প্রতিকারের আশায় এখন আমি আপনার কাতারে শামিল হয়েছি। কৃতকর্মের তওবার উদ্দেশ্যে আমি আপনার পক্ষ হয়ে যুদ্ধের ময়দানে জীবন উৎসর্গ করতে চাই।'

ইতিমধ্যে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' অশ্বে আরোহণ করে সামনে অগ্রসর হলেন এবং উভয় পক্ষের সৈন্যদের উদ্দেশ্যে বললেন–

'হে লোক সকল! তাড়াহুড়া না করে আমার কথা মনযোগ দিয়ে শুন। আমি তোমাদের কিছু নসীহত করে আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেতে চাই এবং তোমাদের জানিয়ে যেতে চাই, আমি কেন এখানে এসেছিলাম। এমন সময় শিবিরে অবস্থানরতা মহিলাগণ নিজেদের আর স্থীর রাখতে না পেরে উচ্চস্বরে কান্নাকাটি আরম্ভ করে দিলেন। তখন তিনি ভাই আব্বাসকে শিবিরে পাঠালেন তাদের শান্ত করার জন্য এবং বললেন–

'আল্লাহ তা'আলা ইবনে আব্বাসকে ('রাযিয়াল্লাহু আনহু') দীর্ঘজীবি করুন। তিনি আমায় সঠিক পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, মেয়েদের সাথে নিবেন না।'

শিবিরের ভিতর মহিলাগণ শান্ত হয়ে গেলে তিনি তাদের উদ্দেশ্যে অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় এক ঐতিহাসিক ভাষণ দিলেন। হামদ ও সালাতের পর তিনি বললেন–

'হে লোক সকল! তোমরা আমার ধমনিতে প্রবাহমান রক্তের কথা ভেবে দেখ তো! আমি কে? তোমাদের মনকে জিজ্ঞেস করে দেখ! আমাকে হত্যা করা তোমাদের জন্য কতটুকু সমীচিন হবে? আমার মর্যাদাহানী কি তোমাদের জন্য সুখ বয়ে আনবে? এমন ভেবে থাকলে তোমরা মারাত্মক ভুলের মাঝে আছ। আমি তো তোমাদের নবী কন্যা হযরত ফাতিমা 'রাযিয়াল্লাহু আনহা'-এরই গর্ভজাত সন্তান। আমি তো রাসুলুল্লাহ 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামে'র চাচাত ভাই শেরে খোদা হযরত আলী 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'রই পুত্র। 'সাইয়্যেদুশ্ শুহাদা' হযরত হামযা 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' আমারই পিতার চাচা ছিলেন। হযরত জা'ফর তাইয়্যার 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' ছিলেন আমার আপন চাচা। প্রসিদ্ধ সেই হাদীসটি কি তোমারা কোনদিন শুনোনি? যাতে আমাদের

দু'ভাই সম্পর্কে নানাজী বলেছেন– 'জান্নাতের যুব সমাজের সর্দার হবে, হাসান ও হুসাইন।' অন্যত্র তিনি বলেছেন– 'এরা উভয়ই সঠিক পথ অবলম্বনকারীদের নয়নমণি।'

আমার এ কথাগুলো তোমরা নির্বিঘ্নে বিশ্বাস করতে পার। খোদার শপথ! আমার প্রতিটি কথাই সত্য এবং নিশ্চয়ই সত্য। কারণ 'মিথ্যা কথায় আল্লাহ তা'আলা অসন্তুষ্ট হন' এ কথা জানার পর থেকে আজ পর্যন্ত কোন দিন আমি মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিনি। আমার কথা তোমাদের বিশ্বাস না হলে এখনও তোমাদের মাঝে এমন লোক আছেন, যাঁদের নিকট এর সত্যতা যাঁচাই করতে পার।

জিজ্ঞাসা কর জাবের ইবনে আব্দুল্লাহকে, আবু সাঈদ অথবা ইবনে সা'আদ 'রাযিয়াল্লাহু আনহুম'কে, জিজ্ঞাসা কর যায়েদ ইবনে আরকাম অথবা হযরত আনাস 'রাযিয়াল্লাহু আনহুমা'কে। তাঁরা প্রত্যেকেই আমার কথার সত্যতা স্বীকার করে বলবেন যে, এ কথাগুলো তাঁরা রাসুলুল্লাহ 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' থেকে শ্রবণ করেছেন।

আমার এ কথাগুলোকে সত্য বলে মেনে নেয়ার পরও কি তোমরা পারবে আমাকে হত্যা করতে? তোমরা আমাকে বল, আমি কি কাউকে হত্যা করেছি? যে প্রতিশোধের তাড়নায় তোমরা আমাকে রক্তের স্রোতে বইয়ে দিতে চাচ্ছ? আমি কি তোমাদের কারো ধন-সম্পদের প্রতি লোলুপ দৃষ্টিতে তাঁকিয়েছি, যার ফলশ্রুতিতে তোমরা আমার সাথে এমন আচরণ করছ?'

এরপর তিনি কূফার শীর্ষস্থানীয় সর্দারদের নাম উল্লেখ করে বললেন– 'হে শীশ ইবনে রুবাঈ! হে হাজ্জার ইবনে আব্হুর! হে কাইস ইবনে আশ'আস! হে যায়েদ ইবনে হারেস! তোমরা কি আমাকে কূফায় আগমনের অনুরোধ জানিয়ে পত্র লিখনি?'

তারা সকলে অস্বীকার করে বলল– 'আমরা আপনার নিকট কোন পত্র লিখি নাই।' হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' বললেন– 'অবাক লাগে তোমাদের উত্তর শুনে। এখনও আমার নিকট তোমাদের সকলের পত্র সংরক্ষিত রয়েছে।'

তিনি আবার বলতে লাগলেন– 'লোক সকল! আমার আগমন যদি নিতান্তই তোমাদের নিকট তিক্ত মনে হয়। তবে তোমরা আমার রাস্তা হতে সরে দাঁড়াও। আমি এমন এক স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করব , যেখানে আমার নিজের জীবনের নিরাপত্তা রয়েছে।'

এ সময় কাইস ইবনে আশ'আছ বলে উঠল– 'ইবনে যিয়াদের প্রস্তাব মেনে নিলেই তো পারেন। সে আপনার সাথে ভাল ব্যবহার করবে। আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করার সাহস সে দেখাবে না। আপনার মর্যাদাহানী হয় এমন কাজও সে করবে না।'

উত্তরে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' বললেন– 'মুসলিম ইবনে আকীলকে হত্যা করতে যাদের হাত কাঁপেনি। তাদের ব্যাপারে এ নিশ্চয়তা কিভাবে দিচ্ছ তোমরা! যে, তারা আমার সাথে ভাল ব্যবহার করবে? মুসলিম ইবনে আকীলকে হত্যার আগে তোমরা কি ভেবেছিলে, তাঁকে এমন নির্মমভাবে হত্যার দুঃসাহস তারা দেখাবে? কিন্তু তোমাদের ভাবনাকে কল্পনার সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে তাঁকে শহীদ করতে তারা সামান্য কুণ্ঠিত হয়নি। এখন তোমরাই বল, আমি কি করে তোমাদের এ প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারি? এ যে স্বেচ্ছায় নিজের জীবনকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়ারই নামান্তর হবে। এ সমস্ত দিক বিবেচনা করে আমি তোমাদের এ প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারি না।'

এ কথাগুলো বলে তিনি ঘোড়া থেকে নেমে এলেন। এ সময় 'যুহাইর ইবনুল ক্বীন' অশ্বে আরোহণ করে সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে সৈন্যদের উদ্দেশ্যে বললেন–

'হে কূফাবাসী! এখনো সময় আছে। তোমাদের হাত গুটিয়ে নাও। তলোয়ার খাপে ভরে নাও। রাসূলুল্লাহ 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামে'র পবিত্র বংশের রক্তে তোমাদের হাতকে রঞ্জিত কর না। ফলাফল তোমাদের জন্য বড় ভয়াবহ হবে। আজ যদি ইবনে যিয়াদের পক্ষ নিয়ে তোমরা এ মর্মান্তিক দুর্ঘটনার অবতারণা ঘটাও, তবে মনে রেখ; ইবনে যিয়াদের কুদৃষ্টি

থেকে তোমরা কেউ রেহাই পাবে না। এ জন্য তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। তোমাদের হত্যা করতেও সে কুণ্ঠিত হবে না।'

যুহাইরের এ ভাষণ শ্রবণে কূফাবাসী তাঁকে অশালীন ভাষায় গাল-মন্দ করে ইবনে যিয়াদের গুণকীর্তন গেয়ে বলতে লাগল- 'আমরা তোমাদের প্রত্যেককে হত্যা করে ইবনে যিয়াদের সামনে উপস্থিত করব।'

যুহাইর বলল- 'হে জালেম সম্প্রদায়! এখনও কি তোমাদের চেতনা জাগরিত হবে না? হযরত ফাতিমা 'রাযিয়াল্লাহু আনহা'র সন্তান হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র তুলনায় 'সুমাইয়্যা'র পুত্র ইবনে যিয়াদের সম্মান কি তোমাদের নিকট বেশী হয়ে গেল? যদি তোমরা নিজেদের হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র সাহায্য সহযোগিতায় এগিয়ে আসতে অক্ষম মনে কর, তবে তাঁর পথে প্রতিবন্ধক না হয়ে তোমরা এ পথ থেকে সরে দাঁড়াও। তিনি নিজেই ইয়াযীদের সাথে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। খোদার শপথ! ইয়াযীদ ইবনে মু'আবিয়া এ কারণে তোমাদের উপর অসন্তোষ প্রকাশ করবেন না।'

আলোচনা দীর্ঘায়িত হতে দেখে শিমার সর্ব প্রথম যুহাইরকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করলে তিনি পিছু হটে গেলেন।

অতঃপর হুর ইবনে ইয়াযীদ সামনে এগিয়ে সকলকে উদ্দেশ্য করে বললেন-

'ধ্বংস হোক হে কূফাবাসী তোমাদের! তোমরা কি এজন্যই হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'কে কূফায় আহ্বান করে ছিলে যে, তিনি তাশরীফ আনলে তোমরা তাঁকে হত্যা করবে? তোমাদের আহ্বানের ভাষা তো ছিল- 'আপনার তরে আমাদের জান-প্রাণ সবই উৎসর্গ হোক। আপনি বিলম্ব না করে আমাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে এগিয়ে আসুন। আমরা সর্বোতভাবে আপনার সাহায্য সহযোগিতা করতে প্রস্তুত।' আজ তোমারাই তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছ। তাঁর প্রতি সহানুভূতি তো দূরের কথা, তাঁকে পরিবার-পরিজন নিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাওয়ার সুযোগটুকু দিতেও তোমারা প্রস্তুত নও। চতুর্দিক থেকে তাঁকে তোমরা ঘিরে রেখেছ। এমনকি যে ফোরাতের পানি

বৌদ্ধ, খৃষ্টান, ইহুদী, অগ্নি পূজারী, বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে সকলেই ব্যবহার করতে পারে। আল্লাহ'র নিকৃষ্টতম প্রাণী শুকর পর্যন্ত যে পানির দ্বারা তৃষ্ণা নিবারণ করতে পারে। সেই ফোরাতের পানি থেকেও তোমরা তাঁকে বঞ্চিত রেখেছ। যাঁকে উপলক্ষ্য করে এ বিরাট জাহান আল্লাহ পাক সাজিয়েছেন, সেই নবীর বংশধররা এক ফোটা পানির অভাবে তৃষ্ণায় ধুকে ধুকে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। মনে রেখ; কিয়ামতের ময়দানে এক ফোটা পানির জন্য তোমরা কাতরাতে থাকবে, তখন তোমাদের সাহায্যে কেহ এগিয়ে আসবে না। নবীর বংশধরদের এ চরম কষ্ট দেয়ার শাস্তি তখন তোমরা হাড়ে হাড়ে টের পাবে। ভেবে দেখ, এখনো সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের সময় আছে। সময় থাকতে আল্লাহ'র দরবারে তোমাদের কৃত কর্মের জন্য ক্ষমা চেয়ে নাও। পরে হাজারো আফসোস করে কোন লাভ হবে না।'

শিমার নিজেকে আর স্থীর রাখতে না পেরে সৈন্যদের তীর নিক্ষেপের আদেশ দিল। হুর ইবনে ইয়াযীদও বীরবিক্রমে সায়্যিদিনা হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'কে আড়াল দিয়ে শত্রুদের দিকে তীর নিক্ষেপ করতে আরম্ভ করলেন।

দেখতে দেখতে উভয় পক্ষের ভিতর তুমূল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। শত্রুপক্ষের অনেকেই তীরের আঘাতে মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ল। হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'রও কিছু সাথী শাহাদাতের পেয়ালায় ঠোঁট ছুঁয়ালেন। হুর ইবনে ইয়াযীদ মরণপণ যুদ্ধ করে অসংখ্য শত্রুকে হত্যা করলেন। ধীরে ধীরে সময় গড়ানোর সাথে সাথে যুদ্ধ তীব্র থেকে তীব্রতর আকার ধারণ করল। শত্রুপক্ষ কোনক্রমেই এই অল্প কয়জন লোকের ঈমানী বলের মুকাবিলায় কুলিয়ে উঠতে পারছিল না।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে, পাপিষ্ট শিমার যুদ্ধের কৌশল পরিবর্তন করে সেনা বাহিনীকে এক সাথে চতুর্দিক দিক থেকে আক্রমণ করার নির্দেশ দিল। হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র সংগী সাথীরা বীর-বিক্রমে তাদের মুকাবিলা করে যেতে লাগলেন। রণাঙ্গনের যে দিকেই তাঁরা অগ্রসর হচ্ছিলেন, শত্রুবাহিনীকে নাস্ত-নাবূদ করে ছাড়ছিলেন। শত্রুবাহিনী পালানোর পথ খোঁজে পাচ্ছিল না। উরওয়াহ্ ইবনে কাইস অবস্থা

বেগতিক দেখে উমর ইবনে সা'আদ থেকে অতিরিক্ত সৈন্য তলব করে শীশ ইবনে রুবাঈ'-এর উদ্দেশ্যে বলল– 'তুমি নিষ্ক্রীয় কেন শীশ? অগ্রসর হয়ে যুদ্ধ কর।'

ইবনে রুবাঈ নিজেকে আর স্থীর রাখতে না পেরে কঠোর ভাষায় তার উত্তর দিলেন– 'হে পথভ্রষ্ট মুর্খের দল! চরিত্রহীন 'সুমাইয়্যা' পুত্রের পক্ষ অবলম্বণ করে তোমরা বর্তমান দুনিয়ার সবচেয়ে নামীদামী ও সম্মানী ব্যক্তির সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছ। লাজ্জায় মাথা নুয়ে আসে তোমাদের অবস্থা দেখে।'

উরওয়াহ্ ইবনে কাইসের অনুরোধে উমর ইবনে সা'আদ অতিরিক্ত আরও সৈন্য পাঠালেন। রণাঙ্গনে সৈন্যবাহিনী বৃদ্ধির ফলে যুদ্ধের তীব্রতা আরও বৃদ্ধি পেল। হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র সংগীগণ অত্যন্ত দক্ষতা আর সাহসিকতার সাথে শত্রুপক্ষের মুকাবিলা করে সামনে অগ্রসর হতে লাগলেন। বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে যুদ্ধ করতে করতে এক পর্যায় 'হুসাইনী বাহিনী' ঘোড়া থেকে বাজ পাখির মত শত্রুর উপর এক সাথে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। হুর ইবনে ইয়াযীদ তখনও বীর বিক্রমে সমান তালে শত্রুদের মুকাবিলা করে যাচ্ছিলেন। পরিস্থিতি ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে, শত্রুপক্ষ 'হুসাইনী শিবির'গুলোতে আগুন ধরিয়ে দিল। ইতিমধ্যে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র অনেক সাথী-সংগীই শাহাদাতের সৌভাগ্য লাভ করেছেন। শত্রুপক্ষ ধীরে ধীরে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র দিকে অগ্রসর হতে লাগল। এ সময় হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র এক সাথী তাঁর নিকট এসে আরয করলেন–

'আমার মাতা-পিতা আপনার তরে উৎসর্গিত। আমার খুব সাধ হয়, যুদ্ধ করতে করতে আপনার চোখের সামনে জীবন দিয়ে দেই। আপনার সামনেই শত্রুপক্ষ আমাকে হত্যা করুক। এখন যোহরের নামাযের সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। আপনি অনুমতি দিলে নামায আদায় করে আমি আল্লাহ'র দরবারে উপস্থিত হব।'

হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' উচ্চস্বরে উভয় পক্ষের সৈন্যদের উদ্দেশ্যে বললেন– 'নামাযের সময় চলে যাচ্ছে। তাই নামায আদায় করার

জন্য আপততঃ যুদ্ধ মুলতবী ঘোষণা করা হোক।'

কিন্তু এ পরিস্থিতিতে কে শুনে কার কথা; বরং যুদ্ধের তীব্রতা উত্তরোত্তর শুধু রেড়েই চলল। বীর বিক্রমে যুদ্ধ করতে করতে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র ঐ সাথীটি শাহাদাত বরণ করলেন।

যুদ্ধ বিরতির কোন লক্ষণ না দেখে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' সাথীদের নিয়ে 'সালাতুল খাউফ'-এর নিয়মানুযায়ী নামায আদায় করে নিলেন। নামাযের পর যুদ্ধের তীব্রতা পূর্বের তুলনায় শত গুণে বৃদ্ধি পেল। একে একে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র সকল সংগীই শাহাদাতের শরাব পান করলেন। মাত্র কয়েকজন সাথী নিয়ে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এ সময় যুহাইর ইবনুল ক্বীন নিজেকে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র প্রতিরক্ষার কাজে নিয়োজিত করলেন। তিনি প্রসংশনীয় বীরত্বের সাথে শত্রুদের মুকাবিলা করতে করতে শাহাদাত বরণ করলেন।

এমন অবস্থায় সাথীরা এ কথা নিশ্চিতভাবেই বুঝতে পারছিলেন যে, আমাদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করেও আর হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'কে রক্ষা করতে পারব না। এমন কি নিজের প্রাণ বাঁচানোর কোন পথও এখন আর খোলা নেই। তদুপরি অলৌকিক ঈমানী বলে খোদার রাহে জীবন উৎসর্গ করার সুতীব্র বাসনা এবং হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র সামনে প্রাণ বিসর্জন দেয়ার মানসিকতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁরা যেন নতুন সাহসে, নতুন মনোবলে শাহাদাতের সৌভাগ্য লাভের হাতছানিতে বিপুল বিক্রমে শত্রু নিধন করতে লাগলেন। নিশ্চিত মৃত্যুর ভয়াবহতা যেন তাঁদের আরো ক্ষেপিয়ে তুলল। প্রত্যেকের মাঝে শত্রু বাহিনীকে পর্যদুস্ত করার মনসিকতায় প্রতিযোগিতা শুরু হল। অত্যন্ত বীরত্বের সাথে তাঁরা অব্যাহত গতিতে যুদ্ধ করে যেতে লাগলেন। এ সময় হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র সাহেবজাদা আলী একটি কবিতা আবৃতি করতে করতে যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হলেন। যার ভাবার্থ হলো-

'আমি আলী ইবনে হুসাইন ইবনে আলী। কাবার প্রভুর শপথ! আমি

নবীর নিকটবর্তী হওয়ার বেশী অধিকারী।'

তিনি কবিতার এই পংক্তি দু'টি ইয়াযীদ বাহিনীর সামনে উচ্চস্বরে আবৃতি করে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি যে দিকেই যাচ্ছিলেন, সে দিকেই শত্রু বাহিনীর মাঝে ত্রাস সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছিল। শত্রু বাহিনীর কাউকে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করছিলেন। আবার কাউকে জাহান্নামের ঠিকানা বাতলে দিচ্ছিলেন। তাঁর বিরামহীন আক্রমণের সামনে কেউ স্থীর থাকতে পারছিল না। পরিস্থিতি ভয়াবহ দেখে কেউ আর এগিয়ে আসার সাহস পাচ্ছিল না। যাকে আক্রমণ করছিলেন তাকেই তিনি বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন যুদ্ধের স্বাদ কাকে বলে। অবস্থা বেগতিক দেখে হতভাগা 'মুররা ইবনে মুনকিজ' বর্ষা দ্বারা তাঁর উপর মারাত্মকভাবে আঘাত করে বসল। সুযোগ বুঝে পাপিষ্টরা সব একসাথে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। দুর্ভাগারা তাঁকে শহীদ করে লাশকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলল।

এই ক্ষত-বিক্ষত লাশ দেখে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' বললেন– 'এমন নির্দোষ বালককে যারা হত্যা করতে কুণ্ঠিত হয় না, আল্লাহ পাক সেই গোত্রকে নির্মূল করে দিন।' এ কথা বলে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' লাশটি কোলে করে নিয়ে শিবিরের পাশে শুইয়ে দিলেন।

অন্যদিকে আমর ইবনে সা'আদ ইবনে নুফাইল আয্‌দী' হযরত হাসানের পুত্র কাশেমের মাথায় তরবারী দ্বারা প্রচণ্ড আঘাত করায় তিনি গুরুতর আহত অবস্থায় চিৎকার করে বলে উঠলেন– 'চাচাজান! আমায় বাঁচান!' এই আওয়াজ শুনে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' ছুটে গিয়ে তরবারী দ্বারা আ'মর ইবনে সাআদের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ করে দেহ থেকে তার ডান হাতের কনুই পর্যন্ত আলাদা করে ফেললেন। তারপর তিনি ভাতিজা কাশেমের লাশকেও কাঁধে নিয়ে পুত্র আলী আকবরের পাশে শুইয়ে দিলেন। (১)

---

(১) আল-কামেল লি- ইবনে আছীর, খণ্ড - ৩, পৃষ্ঠা - ২৮৬-২৮৬
আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, খণ্ড - ৮, পৃষ্ঠা - ১৭৮-১৮৫
তারীখে তাবরী, খণ্ড - ৪, পৃষ্ঠা - ৩২০-২৪১
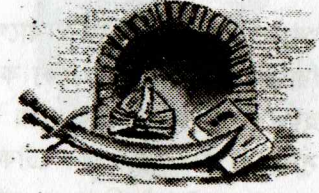
হযরত হুসাইন (রাঃ)-এর শাহাদাত

শাহাদাতের অদম্য স্পৃহা ও রেযায়ে মাওলার বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র সাথী-সঙ্গীরা পরলোকের ডাকে সাড়া দিয়ে একে একে নিজেকে মৃত্যুর কোলে সঁপে দিলেন। জীবন বাজি রেখে বীরদর্পে যুদ্ধ করতে করতে সবাই তখন তাঁকে একা ফেলে দুনিয়া থেকে চির বিদায় নিলেন। তখনও শত্রু বাহিনীর কারো সাহসে কুলাচ্ছিল না অস্ত্র হাতে তাঁর দিকে এগুবার। একদিকে সাথী-সঙ্গী হারা মা'মূলী অস্ত্র হাতে ক্লান্ত-ক্ষুধার্ত, পিপাসায় কাতর একা এক বিদেশী মুসাফির। অন্যদিকে বিভিন্ন অস্ত্রেশস্ত্রে সুসজ্জিত স্থানীয় বেনিয়াদের এক বিরাট বাহিনী। এক দিকে 'মরলে শহীদ বাঁচলে গাজী'র চেতনায় উদ্বেলিত এক আহত চিতা, অন্যদিকে ক্ষমতালিপ্সু খুন পিয়াসীদের পদলেহী একদল ধূর্ত শৃগাল।

একে তো হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র অস্ত্রের সামনে হাজির হওয়ার সাহস কারো হচ্ছিল না। দ্বিতীয়তঃ এতো বড় পাপের বোঝা কেউ নিজের মাথায় নিতে রাজি ছিল না। এই জটিল পরিস্থিতিতে 'কিন্দা' গোত্রের 'মালিক ইবনে নুসাইর' নামক এক পাষণ্ড হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র মাথা লক্ষ্য করে তলোয়ার চালাল। তিনি এ আঘাতে মারাত্মকভাবে আহত হয়ে পড়লেন। আঘাতের যন্ত্রণায় তিনি ছটফট করছিলেন। এ সময় তাঁর কোলে ছিল নিজের শিশু বাচ্চা আব্দুল্লাহ। তাকে তিনি আদরে-সোহাগে মাতিয়ে রাখছিলেন। বনী আস'আদের এক নির্দয় পাষণ্ড বাচ্চাটিকে উদ্দেশ্য করে তীর ছুড়লে, তীরের আঘাতে সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চাটিও মৃত্যুকোলে ঢলে পড়ল। হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' এই নিষ্পাপ শিশুটিকে মাটির উপর শুইয়ে দিয়ে খোদার দরবারে প্রার্থণা করলেন– 'প্রভু হে! তুমি নিজেই এই অত্যাচারীদের প্রতিশোধ গ্রহণ কর।'

পানির প্রচণ্ড তৃষ্ণা আর সহ্য করতে না পেরে তিনি ফোরাতের দিকে

অগ্রসর হলেন। এই সুযোগে 'হাসীন ইবনে নুমাইর' হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'কে লক্ষ্য করে তীর ছুড়লে তা গিয়ে তাঁর কণ্ঠদেশে বিদ্ধ হয়। ফলে রক্তের ধারা বয়ে যায় কণ্ঠনালী থেকে। এ সময় শিমার অস্ত্রে সুসজ্জিত দশ জনের এক চৌকস বাহিনী নিয়ে আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত তৃষ্ণার্ত হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র দিকে অগ্রসর হতে থাকে। এই করুণ অবস্থাতেও কোন্ অলৌকিক শক্তি যেন তাঁর উপর ভর করল। তিনি একা এই দশজনের বিরুদ্ধে বীরদর্পে অব্যাহত গতিতে লড়ে যেতে লাগলেন। তাঁর বিরামহীন তীব্র আক্রমণের সামনে কেউ আর স্থীর থাকতে পারছিল না। তিনি যে দিকেই অগ্রসর হচ্ছিলেন, শত্রুরা সেদিক থেকেই পিছু হটতে বাধ্য হচ্ছিল।

ইতিহাসবিদদের মতে এটি একটি অসাধারণ ঘটনা। যার চোখের সামনে পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন খোদার রাহে একে একে প্রাণ বিসর্জন দিলেন। নিজেও যিনি শত্রুদের আঘাতে মারাত্মকভাবে আহত। এমন একজন লোক কি করে এমন নির্বিকারভাবে দৃঢ়তা ও বীরত্ব সহকারে যুদ্ধ অব্যাহত রাখতে পারলেন! এ তো কল্পনা করতেও কষ্ট হয়, এমন এক ব্যক্তির আক্রমণের তীব্রতার সামনে সুসজ্জিত এক বিরাট বাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হচ্ছে। প্রাণ রক্ষা করাই যেন তাদের জন্য দুরূহ হয়ে দাঁড়াচ্ছে?

শিমারের এ অবস্থা আর সহ্য হল না। সে চিৎকার করে সকলকে একযোগে আক্রমণ করার আহ্বান জানাল। তার এই ডাকে সাড়া দিয়ে কয়েকজন দুর্ভাগা একযোগে তাঁর উপর আক্রমণ চালাল। তাদের ঐক্যবদ্ধ হামলার তীব্রতা সইতে না পেরে রাসূলুল্লাহ 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম'-এর কলিজার টুকরা হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' বীরত্বের সাথে লড়তে লড়তে শাহাদাতের শরাব পান করলেন। সেই সাথে হিজরত করে গেলেন এ নশ্বর পৃথিবী থেকে অন্তলোকের চিরশান্তির নীড়ে। 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন।'
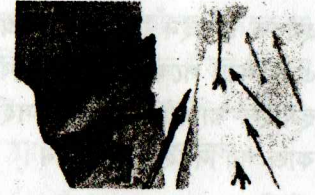
শুহাদায়ে কারবালার সাথে অমানবিক আচরণ

হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র শাহাদাতের পর শিমারের নির্দেশ মুতাবেক 'খাওলা ইবনে ইয়াযীদ' হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র পবিত্র দেহ থেকে শিরোচ্ছেদ করতে এগিয়ে গেল। কিন্তু পরক্ষণই এক ভয়াবহ ভীতি তার হৃদকম্পন শুরু হল এবং ভয়ে সে পিছু হটে গেল। শেষ পর্যন্ত পাপিষ্ট 'সিনান ইবনে আনাস' এ জঘন্য কাজটিকে বড় নির্মমভাবে সমাধা করল। অনুসন্ধানের পর হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র দেহ মুবারকে মোট ৩৩টি বর্শার আঘাত এবং ৩৪টি তরবারীর আঘাত ছাড়াও অসংখ্য তীরের জখমের চিহ্ন পাওয়া গেল।

পাপিষ্টরা হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'সহ আহলে বাইতের সকলকে হত্যা করার পর অসুস্থ জয়নুল আবেদীনকে হত্যা করতে উদ্যত হলে 'হুমাইদ ইবনে মুসলিম' এ অপকর্ম থেকে শিমারকে বাধা দিয়ে বললেন– 'সুবহানাল্লাহ! অসুস্থ শিশুকে হত্যা করতেও তোমার বিবেকে বাধে না?' তার কথা শুনে শিমার পিছিয়ে গেল।

এ দিকে উমর ইবনে সা'আদ নির্দেশ জারি করলেন– 'মেয়েদের তাবুর কাছে কেউ আসবে না এবং অসুস্থ শিশুদের উপর কেউ হাত তুলতে পারবে না।'

কমবখ্ত ইবনে যিয়াদের নির্দেশ মুতাবেক উমর ইবনে সা'আদ কয়েকজন সঙ্গীকে আদেশ দিলেন, হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র পবিত্র দেহকে ঘোড়ার পায়ের তলায় পিশে ফেলতে। এই জঘন্যতম কাজটি করতেও অভাগাদের হৃদয়ে সামান্যতম দয়ার উদ্রেক হল না। এই নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করতে তাদের অন্তরটা এতটুকু কাঁপল না।

যুদ্ধের পর নিহতদের গণনা করে দেখা গেল যে, আহলে বাইত ও

হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র পক্ষের বাহাত্তর ব্যক্তি শহীদ হয়েছেন এবং শত্রু পক্ষের মৃতের সংখ্যা ছিল ৮৮। 'গাজেরিয়া'র বাসিন্দারা হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'সহ আহলে বাইতের ৭২ জনের দাফন-কাফনের কাজ পর দিনই শেষ করেন।

খাওলা ইবনে ইয়াযীদ ও হুমাইদ ইবনে মুসলিম যখন হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'সহ শহীদানে কারবালার শিরগুলো ইবনে যিয়াদের দরবারে উপস্থিত করল। ইবনে যিয়াদ তখন কূফার সর্বস্তরের লোককে একত্রিত করে শিরগুলোকে তাদের সামনে রাখল। এ সময় সে হাতে একটি চাকু নিয়ে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র ঠুঁটে খোঁচা দিচ্ছিল। এ দৃশ্য দেখে বয়োঃবৃদ্ধ সাহাবা হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' সহ্য করতে না পেরে কান্না বিজড়িত তেজোদীপ্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন-

'ইবনে যিয়াদ! এই পবিত্র শির থেকে তোমার চাকু সরিয়ে নাও। আমি অসংখ্যবার এই উষ্ঠদ্বয়ে রাসূলুল্লাহ 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম'কে চুমু খেতে দেখেছি।' এ কথায় ইবনে যিয়াদের রাগ আরো বেড়ে গেল। সে বলে উঠল- 'আজ যদি তুমি বৃদ্ধ না হতে, তবে আমি এখনই তোমার শিরোচ্ছেদের হুকুম দিতাম।'

হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম এ কথা বলতে বলতে দরবার থেকে বেরিয়ে গেলেন- 'হে জাতি! তোমরা আজ ফাতিমার সন্তানের রক্তে নিজেদের হাত রাঙ্গাতে কুণ্ঠিত হলে না! তাঁকে হত্যা করে তোমরা 'মারজানা'র সন্তান (ইবনে যিয়াদ) কে তোমাদের শাসক হিসেবে গ্রহণ করলে! যে লোক শত শত নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করে। আর দুষ্ট ও অপরাধপ্রবণ লোকদের প্রশ্রয় দেয়। যে ক্ষমতার অপব্যবহার করে দুশ্চরিত্র লোকদের ফাসাদ সৃষ্টির সুযোগ করে দেয়। ধিক! তোমাদের এই জঘন্য মনোবৃত্তির। আল্লাহ'র অভিশাপ নেমে আসুক তোমাদের মত স্বাপদদের উপর।'

দু'দিন পর উমর ইবনে সা'আদ অবশিষ্ট আহলে বাইতের সদস্যদের সাথে নিয়ে কূফা অভিমুখে যাত্রা শুরু করলেন। সবাইকে নিয়ে যখন ইবনে যিয়াদের দরবারে উপস্থিত হলেন। তখন হযরত হুসাইনের বোন যয়নাব নিতান্তই জীর্ণ-শীর্ণ পোষাকে, বড় করুণ অবস্থায় ছিলেন। কয়েকজন পরিচারিকা

পরিবেষ্টিত হয়ে তিনি এক জায়গায় নিরবে বসে ছিলেন। তাঁকে চিনতে না পেরে ইবনে যিয়াদ প্রশ্ন করল- 'ইনি কে?' তিনি এ কথার কোন উত্তর দিলেন না। এমনিভাবে কয়েকবার একই প্রশ্ন করার পর এক পরিচারিকা উত্তর দিল- 'ইনি হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র বোন যয়নাব বিনতে ফাতিমা।'

এ কথা শুনে ইবনে যিয়াদ বলে উঠল- 'আল্লাহ'র শোকর যে, তিনি তোমাদের অপমানিত ও ধ্বংস করেছেন।'

হযরত যয়নাব বললেন- 'শত সহস্র প্রশংসা ঐ আল্লাহ তা'আলার যিনি আমাদেরকে মুহাম্মদ 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামে'র বংশের মর্যাদা দান করেছেন এবং আমাদের পবিত্রতার কথা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন। আর লাঞ্ছিত শুধুমাত্র তারাই হয়ে থাকে, যারা আল্লাহ'র আদেশ অমান্য করে বিপথগামী হয়।'

ইবনে যিয়াদ অতি রাগান্বিত হয়ে বলল- 'আল্লাহ তা'আলা আমাকে তোমাদের বিদ্রোহ থেকে মুক্ত করেছেন এবং তোমাদের দাম্ভিকতাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছেন।'

হযরত যয়নাব তখন আর আত্ম-সংবরণ করতে পারলেন না। তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন এবং বললেন- 'তুমি আমাদের ছোট-বড় নির্বিশেষে সকলকে হত্যা করেছ। আর এর দ্বারাই যদি তোমার আত্মপ্রশান্তি হয় তো হোক।'

অতঃপর ইবনে যিয়াদের কুদৃষ্টি নিপতিত হল হযরত আলী আসগরের (জয়নুল আবেদীন) প্রতি। ইবনে যিয়াদ জিজ্ঞেস করল- 'তোমার নাম কি?'

তিনি বললেন- 'আমার নাম আলী।'

ইবনে যিয়াদ ব্যতিব্যস্ত হয়ে বলল- 'তাকে না হত্যা করা হয়েছে?'

উত্তরে তিনি বললেন- 'আমার বড় ভাইয়ের নামও ছিল আলী। হত্যা করা হয়েছে তাঁকে। আমাকে নয়।'

এ কথা শুনে ইবনে যিয়াদ তাঁকেও হত্যা করার জন্য উদ্যত হলে আলী আসগর (জয়নুল আবেদীন) বললেন- 'আমাকে হত্যা কর, তাতে আমার কোন আফসোস নেই। বরং এই অবস্থায় জীবিত থাকাটাই আমার জন্য বেশী

কষ্টদায়ক। কিন্তু একবারও কি ভেবে দেখেছ! আমাকে হত্যা করা হলে এই অসহায় অবলা নারীদের কি অবস্থা হবে? ভাব নি, আর তা ভাববার সময় বা মানসিকাতও তোমার নেই।'

দু'জনের আলাপচারিতার মাঝেই হযরত যয়নাব চিৎকার করে বলে উঠলেন– 'হে ইবনে যিয়াদ! আমাদের রক্তের পিয়াস কি তোমার এখনো মিটেনি? এই বালকটিও কি তোমার রাক্ষুসী হাত থেকে রেহাই পাবে না? খোদার দোহাই দিয়ে বলছি, এই বালককে হত্যা করতে হলে আগে আমাকে হত্যা করতে হবে।'

হযরত আলী আসগর আবার বললেন– 'হে ইবনে যিয়াদ! এই লোকদের প্রতি যদি তোমার অন্তরে সামান্যতম মর্যাদাবোধ থেকে থাকে। তবে আমার মৃত্যুর পর তাদের সঙ্গে কোন খোদাভীরু লোককে প্রেরণ কর। যিনি ইসলামী রীতিনীতি অনুযায়ী তাদের সহযোগিতা করবেন।'

ইবনে যিয়াদ এ কথা শুনে বলল– 'আচ্ছা? তাহলে এই বালকটিকেই মুক্ত করে দাও। সে নিজেই এ দায়িত্ব পালন করবে।'

এরই মাঝে ইবনে যিয়াদ কূফার সকল মানুষকে মসজিদে সমবেত করে এক ভাষণ দেয়। ভাষণে সে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' এবং হযরত আলী 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র নাম নিয়ে অত্যন্ত অশালীন ও অপমানজনক ভাষায় ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতে থাকে। মসজিদে 'আব্দুল্লাহ ইবনে আফিফ আযদি'ও উপস্থিত ছিলেন– ইবনে যিয়াদের মুখে হযরত আলী ও হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহুমা' সম্পর্কে এ ধরনের জঘন্য উক্তি শুনে তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন–

'হে মিথ্যাবাদীর সন্তান মিথ্যাবাদী! তুমি নবী বংশের মর্যাদায় আঘাত হেনেছ। তাঁর নিষ্পাপ সন্তানদের হত্যা করেছ। এখন আবার তুমি তাঁদের চরিত্রে কলংক লেপনের দুঃসাহস দেখাচ্ছ।'

এ কথা শুনে ইবনে যিয়াদ তৎক্ষণাৎ তাঁকে গ্রেফতার করার নির্দেশ জারি করল। ইবনে যিয়াদের এই নির্দেশের প্রেক্ষিতে তাঁর গোত্রের সকল লোক ইবনে যিয়াদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার জন্য প্রস্তুতি নিল। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে

রাখার জন্য সে তার নির্দেশ প্রত্যাহার করে নিল।

হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' ও আহলে বাইতের সাথে এমন চরম অবমাননাকর আচরণ করার পরও ইবনে যিয়াদের স্বাদ মিটল না। উপরন্তু তার নিষ্ঠুরতা ও নির্মমতার মাত্রা যেন শুধু বেড়েই চলল। অপমানের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে সে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র শির একটি কাষ্ঠখণ্ডে উঁচিয়ে কূফার অলিতে-গলিতে ঘুরিয়ে জনসাধারণকে এ দৃশ্য দেখানোর নির্দেশ দিল। তার পা'চাটা কুকুরগুলো এ জঘন্যতম কাজটি করতে সামান্যতম দ্বিধাও করল না।

পরিশেষে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদের শির ইয়াযীদের নিকট পাঠানো হল। একই সংগে আহলে বাইতের অবশিষ্ট মহিলা ও শিশু-বাচ্চাদেরও প্রেরণ করা হল। এই পাপের বোঝা বয়ে পুরস্কার প্রাপ্তির আশায় তারা ইয়াযীদের দরবারে উপস্থিত হলে ইয়াযীদ জিজ্ঞেস করল– 'কি সংবাদ নিয়ে এসেছ তোমরা?'

তারা কারবালার ময়দানের বৃত্তান্ত বর্ণনা করে বলল– 'আমীরুল মু'মিনীন! শুনে নিশ্চয় খুশি হবেন যে, আমরা এ যুদ্ধে সম্পূর্ণ বিজয় অর্জন করেছি এবং সকলকে হত্যা করে তাদের শির ও অবশিষ্ট স্ত্রীলোক ও শিশু-বাচ্চাদের আপনার নিকট উপস্থিত করেছি।'

এ সংবাদ শুনে ইয়াযীদ অশ্রুসিক্ত নয়নে বলতে লাগল– 'আমি তোমাদের থেকে এতটুকু আনুগত্যের প্রত্যাশী ছিলাম যে, তোমরা তাঁকে হত্যা না করে বন্দী অবস্থায় আমার সামনে উপস্থিত করবে। 'ইবনে সুমাইয়্যা' (ইবনে যিয়াদ)-এর উপর আল্লাহ তা'আলার লা'নত ও অভিশাপ। সে কেন এদের হত্যার নির্দেশ দিল। খোদার শপথ! আমি যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকলে অবশ্যই তাঁদের ক্ষমা করে দিতাম। আল্লাহ তা'আলা হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'কে তাঁর রহমতের কোলে আশ্রয় দিন!' এরপর ইয়াযীদ তাদের কোন পুরস্কার না দিয়ে বিদায় করল। (১)

---

(১) আল-কামেল লি- ইবনে আছীর, খণ্ড -৩, পৃষ্ঠা -২৯৩-২৯৮
তারীখে তাবরী, খণ্ড -৪, পৃষ্ঠা - ৩৪২-৩৫২
আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, খণ্ড -৮, পৃষ্ঠা -১৮৬-১৯১

ইয়াযীদের নির্দেশে আহলে বাইতের সদস্যদের শাহী মেহমান খানায় প্রেরণ করা হল। একে একে ইয়াযীদ পরিবারের সকলেই তাঁদের সাথে সাক্ষাৎ করে গভীর সমবেদনা প্রকাশ করল। আহলে বাইতের যে সব গয়নাগাটি যুদ্ধের ময়দানে খোয়া গিয়েছিল, তার পরিবর্তে ইয়াযীদ অনেক বেশী পরিমাণে দিয়ে এ দিকটি পুশিয়ে দেয়ার চেষ্টা করল। এবং আহলে বাইতের সকলের থাকার জন্য শাহী মেহমান খানায় বিশেষ ব্যবস্থা করল।(১)
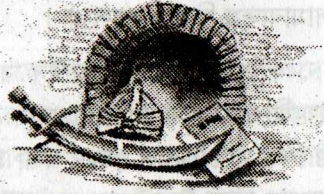
আহলে বাইতের মদীনা যাত্রা

ইয়াযীদের রহস্যময় আচরণ

শাহী মেহমানখানায় বেশ কিছুদিন অবস্থানের পর ইয়াযীদের পক্ষ হতে আহলে বাইতের সকল সদস্যকে সসম্মানে মদীনায় পৌছে দেয়ার সুব্যবস্থা করা হল। পথে যেন তাঁদের কোন প্রকার কষ্ট বা অসুবিধার সম্মুখীন হতে না হয়, সে জন্য নু'মান ইবনে বশীরের উপর তদারকীর দায়িত্ব অর্পন করা হল। নির্দেশ মুতাবেক নু'মান ইবনে বশীর খোদাভীরু, আমানতদার, সৎসাহসী লোকদের নিয়ে একটি দল প্রস্তুত করে ফেললেন।

মদীনার পথে যাত্রার প্রাক্কালে আলী আসগরকে ডেকে ইয়াযীদ কারবালার মর্মান্তিক ঘটনার জন্য সমবেদনা প্রকাশ করে বলল– 'খোদার অভিশাপ 'ইবনে মারযানা (ইবনে যিয়াদ)-এর উপর! ঘটনাস্থলে যদি আমি উপস্থিত থাকতাম। তবে আল্লাহ'র শপথ! আমি তোমার বাবার দেয়া যে কোন শর্ত নির্দ্বিধায় মেনে নিতাম এবং যে কোন উপায়ে আমি এ যুদ্ধ এড়িয়ে অন্য কোন পন্থা অবলম্বন করতাম। রক্ষা করতাম তাঁদের মৃত্যুর হাত থেকে। এই পন্থা

(১) আল-কামেল লি- ইবনে আছীর, খণ্ড -৩, পৃষ্ঠা -২৯৯-৩০০
তারীখে তাবরী, খণ্ড -৪, পৃষ্ঠা - ৩৫২- ৩৫৬

অবলম্বন করতে গিয়ে যে কোন ত্যাগ স্বীকার করতে আমি বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হতাম না। কিন্তু খোদার মর্জী ছিল অন্য রকম। তাই এখন আর আফসোস করেও লাভ হবে না। তিনি যা চেয়েছেন তাই ঘটে গেল। এর অন্যথা করার সাধ্য কারো ছিল না। অতএব যা ঘটে গেছে তা নিয়ে আর মন খারাপ করে লাভ নেই। ঘটনার জন্য যদি আমার প্রতি তোমাদের বিরূপ ধারণা জন্মে থাকে, তবে আমার মনে হয় তা আমার উপর সম্পূর্ণ অন্যায় ও অবিচার করা হবে। কারণ যা ঘটেছে তা আমি তো ঘটাইনি? এমনকি এমন পরিস্থিতির জন্য আমি একেবারে অপ্রস্তুত ছিলাম। যা হোক পরিষ্কার ও খোলা মন নিয়ে মদীনায় ফিরে যাও। কখনো কোন কিছুর প্রয়োজন দেখা দিলে আমাকে জানাতে কুণ্ঠাবোধ করবে না। তোমাদের যে কোন সমস্যা সমাধানের জন্য আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব । ঠিক আছে যাও, আল্লাহ তোমাদের সহায় হোন।'

এখানে ইয়াযীদের আচরণ ছিল রহস্যময়। যে ব্যক্তির কারণে এমন মর্মান্তিক ও হৃদয় বিদারক ঘটনার সূত্রপাত হল, যার বর্বর বাহিনীর পৈশাচিক নিষ্ঠুরতার কারণে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' সপরিবার ও সদলবলে শাহাদাতের অমৃত সুধা পান করলেন, ঘটনার পর সেই ইয়াযীদই আবার ইমাম পরিবারের নিকট সমবেদনা প্রকাশ করছে, ঘটনার জন্য নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের চেষ্টা করছে, আহলে বাইতের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শনে কার্পণ্য করছে না। এটা সত্যিই আশ্চর্যের ব্যাপার বটে। আসলে এ ঘটনার জন্য অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে এমন আচরণ করা বিচিত্র কিছু নয়। হতে পারে ইয়াযীদের হৃদয়পটে ভীষণ আলোড়ন তুলেছিল বলেই সে বাহ্যত এমন প্রশস্ত মনের পরিচয় দিয়েছিল। কিন্তু রাজনৈতিক দূরদৃষ্টিতা নিয়ে পর্যবেক্ষণ করলে এবং ইয়াযীদের পরবর্তী কার্যকলাপ ও পদক্ষেপসমূহ বিশ্লেষণ করলে এ কথাই স্পষ্টতঃ ধরা পড়ে যে, এসবই ছিল তার লোক দেখান নাটক। জনগণের মনের ক্ষোভকে প্রশমিত ও স্তিমিত করে ক্ষমতার ভীতকে আরো মজবুত করাই ছিল তার মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজনে যে কোন অভিনয় করতে বা পদক্ষেপ নিতে সে ছিল বদ্ধপরিকর। তাইত দেখা যায়, জীবন সন্ধ্যায় এসেও মদীনা আক্রমণের দুঃসাহস দেখিয়েছিল সে। যে বৎসর মদীনা আক্রমণ করেছিল সে বৎসরই সে মৃত্যুকোলে ঢলে পড়ে। আল্লাহ তার প্রাপ্য স্থান

তাকে নসীব করুন।

ঘটনা যাই হোক, ইয়াযীদের বিশ্বস্ত ও আমানতদার লোকেরা আহলে বাইতকে সাথে নিয়ে মদীনার পথে যাত্রা করল। পথে তারা সত্যিই তাদের বিশ্বস্ততা ও আমানতদারীর প্রমাণ দিয়েছিল। তাদের কারণে সারা রাস্তায় সামান্য কষ্টও আহলে বাইতকে ভোগ করতে হয়নি। আহলে বাইতের আরাম-আয়েশ ও নিরাপত্তার দিকে ছিল তাদের প্রখর দৃষ্টি। দিনের বেলায় তাদের যে কোন প্রয়োজন দ্বিধাহীন চিত্তে মিটাতে তারা ছিল সদা প্রস্তুত। আর রাতের বেলায় আহলে বাইত ও তাঁদের সাওয়ারীর পাহারায় তারা থাকত অতন্দ্র প্রহরায় নিয়োজিত।

মদীনায় পৌঁছে তাদের ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে হযরত ফাতিমা বিনতে আলী ও হযরত যয়নাব বিনতে আলী নিজেদের অলংকারাদী খুলে তাদের কাছে এই বলে পাঠিয়ে দিলেন– 'সত্যিই তোমাদের ব্যবহারের কোন তুলনা হয় না। তোমাদের খুশী করার মত সামর্থ আমাদের নেই। তবুও আমাদের সাধ্য অনুযায়ী এ গুলো তোমাদের উপহার দিচ্ছি। তোমরা খুশী মনে তা গ্রহণ করে নাও।'

অলংকারগুলো ফিরিয়ে দিয়ে প্রত্যোত্তরে তারা বলল– 'পার্থিব কোন পুরস্কারের মোহে আমরা এ কাজ করিনি– রাসূলুল্লাহর পবিত্র বংশের পূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা প্রতিটি মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব। আমরা শুধু সে দায়িত্বটুকু পালন করেছি।'

মদীনায় আসার পর হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র স্ত্রী স্বামী শোকে ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং এক বৎসর পর স্বামীর সঙ্গ দেয়ার উদ্দেশ্যে এ নশ্বর জগত ত্যাগ করে অবিনশ্বর জগতে পাড়ি জমান। (১)

(১) আল-কামেল লি-ইবনে আছীর খণ্ড -৩ পৃষ্ঠা -৩০০
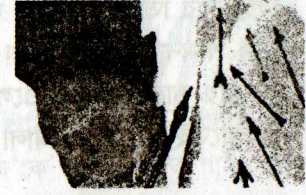
হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের পরিণতি

ফোরাতে পানি পান করতে গিয়ে তীরের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' আল্লাহ'র দরবারে এই বলে মুনাজাত করেছিলেন– 'হে প্রতিপালক! তোমার রাসূলের আদরের দৌহিত্রের সাথে আজ যারা এই অমানবিক আচরণ করেছে। তাদের বিরুদ্ধে আমি শুধু তোমার দরবারেই নালিশ পেশ করছি। এদের একজন একজন করে তুমি ধ্বংস করে দিও। কাউকে তুমি রেহাই দিও না।'

মাযলুমের আহাজারি কবূল হতে বিলম্ব হয় না। তদুপরী রাসূলের দৌহিত্রের পবিত্র কণ্ঠ দিয়ে যে দোয়া বেরিয়েছে, তা কবূল না হওয়ার প্রশ্নই উঠতে পারে না। ফলশ্রুতিতে দেখা গেছে দুনিয়ার বুকেই তারা ভোগ করেছে কঠিন শাস্তি। আখেরাতের নির্ধারিত শাস্তির পূর্বেই তাদের মুখোমুখি হতে হয়েছে ভীষণ কষ্টদায়ক আযাবের। এই পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডে জড়িত কেউ রেহাই পায়নি। কাউকে হত্যা করা হয়েছে বড় নির্মমভাবে। কারো চেহারা হয়ে গেছে বিশ্রী কালো। লাবণ্যের জায়গা দখল করেছে কদার্যতা। কেউ বা আগুনে পুড়ে তীলে তীলে জ্বলে মরেছে। আবার পানির তৃষ্ণায় ছটফট করতে করতে কারো প্রাণ পাখি উড়াল দিয়েছে। কারো আবার দৃষ্টি শক্তি ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। বেঁচে থেকেও দুনিয়ার সৌন্দর্য্য অবলোকন তাদের ভাগ্যে জুটেনি। মানবেতর জীবন যাপনে বাধ্য হয়েছে সকলেই।

মোটকথা– হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র হত্যাকাণ্ডে জড়িত একজন সদস্যও এই দুনিয়াতেই আল্লাহ'র কঠিন পাকড়াও থেকে নিস্তার পায়নি। এ ঘটনার পর ইয়াযীদ একদিনের জন্যও শান্তিতে তার রাজকার্য পরিচালনা করতে পারেনি। ইসলামী রাষ্ট্রের সর্বত্র শহীদদের খুনের প্রতিশোধের আগুন ধাউ ধাউ করে জ্বলে উঠল এবং বিদ্রোহের পর বিদ্রোহ আরম্ভ হল। হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র শাহাদাতের পর এ কঠিন

বিদ্রোহের ভিতর সে মাত্র দুই বৎসর আট মাস, মতান্তরে তিন বৎসর আট মাস শাসনকার্য পরিচালনা করার সুযোগ পেয়েছিল এবং নিতান্তই লাঞ্ছিত অবস্থায় তাকে এই দিনগুলো অতিবাহিত করতে হয়েছিল। আর এই লাঞ্ছিত অবস্থাতেই আল্লাহ তা'আলা তাকে ধ্বংস করেছিলেন। (১)
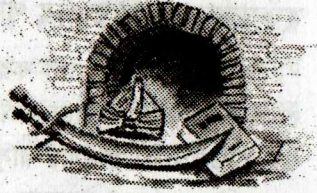
আব্দুল্লাহ ইবনে জা'ফরের মনোভাব

কারবালার যুদ্ধে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জা'ফরের দুই সন্তান শাহাদাতের শরবত পান করেছিলেন। ছেলেদের শাহাদাতের সংবাদ যখন মদীনায় ইবনে জা'ফরের নিকট পৌঁছল, তখন আত্মীয়-স্বজন আর পরিচিতজনরা সমবেদনা জানাতে তাঁর কাছে ছুটে আসতে থাকল। বিভিন্নজন বিভিন্নভাবে তাঁকে শান্তনা দিতে লাগল। সমবেত লোকদের মাঝে একজন হঠাৎ বলে উঠল– 'হুসাইনের কারণে আজ আমাদের এ দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। সে জিদ না করলে এত দুঃখ-কষ্ট হয়ত আমাদের কপালে হত না।'

এ কথা শুনা মাত্রই হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জা'ফর তার দিকে জুতা ছুঁড়ে মারলেন এবং বললেন– 'দুর্ভাগা! তোর স্পর্ধা তো কম নয়। কার বিরুদ্ধে কথা বলছিস জানিস? খোদার শপথ! আমি নিজেও যদি সে দলে শরীক হয়ে শহীদ হতে পারতাম, তবে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করতাম। সেই সৌভাগ্য আমার নসীবে না থাকলেও আমার বড় শান্তনা যে, আমার ছেলেরা সে কাজটুকু করতে পেরেছে।' (২)

১। তারীখে তাবরী, খণ্ড -৪, পৃষ্ঠা -৩৫৭

(২) শহীদে কারবালা (উর্দু) পৃষ্ঠা - ১০০-১০৩

ইবনে আব্বাসের স্বপ্ন

এ ঘটনা প্রসঙ্গে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন– 'আমি এক রাতে রাসূলুল্লাহ 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম'কে স্বপে দেখতে পাই। ঠিক দ্বি-প্রহরের সময়। অত্যাধিক চিন্তান্বিত ও বিষণ্ন মনে হল তাঁকে। কাদাযুক্ত অবস্থায় উদ্ভ্রান্তের ন্যায় ছুটে আসছেন। তাঁর হাতে রক্তে পরিপূর্ণ একটি বোতল দেখা যাচ্ছিল। ইবনে আব্বাস বলেন– আমি রাসূলুল্লাহ 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম'কে প্রশ্ন করলাম– 'হে আল্লাহ'র রাসূল! এই সময়ে এই করুণ অবস্থায় আপনি কোত্থেকে আসছেন?' উত্তরে রাসূলুল্লাহ 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' বললেন– 'হে ইবনে আব্বাস! আমি কি করে মদীনায় শুয়ে থাকতে পারি? আজ আমার কলিজার টুকরা হুসাইনকে কারবালার ময়দানে যালিম ইয়াযীদ বাহিনী টুকরো টুকরো করে ঘোড়ার পায়ের নীচে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছে। আমি আমার কলিজার টুকরার শাহাদাতের মর্মান্তিক ও করুণ দৃশ্য দর্শনের জন্য সেখানে গিয়েছিলাম।'

ইবনে আব্বাস বলেন, আমি পুনরায় প্রশ্ন করলাম– 'হে আল্লাহ'র রাসূল। (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)' আপনার হাতে কি?'

তিনি বললেন– 'ইহা একটি বোতল! কারবালার ময়দান থেকে কিছু রক্ত জমিয়ে এ বোতলে করে নিয়ে এসেছি। কিয়ামতের ময়দানে এ রক্ত পেশ করে আমি এ ঘটনার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আল্লাহ'র দরবারে ফরিয়াদ জানাব।'

এ স্বপ্ন দেখার পর হযরত ইবনে আব্বাস 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' সকলকে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র শাহাদাতের কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন। এর কিছু দিন পর বাস্তবেই হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র শাহাদাতের সংবাদ মদীনায় পৌঁছল। পরে হিসাব করে দেখা গেল, তিনি যেদিন স্বপ্নে দেখেছিলেন, ঠিক সে দিনই হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' শাহাদাত বরণ করে ছিলেন। (১)

(১) শহীদে কারবালা (উর্দু) পৃষ্ঠা - ৯৭
আল-কামেল লি- ইবনে আছীর। ৩য় খণ্ড,

কারবালার শিক্ষা

কারবালার হৃদয় স্পর্শী ঘটনা মূলতঃ একই সাথে বেদনা ও জাগরণের এক যৌথ অধ্যায়। বেদনা, নিষ্ফল বলেই প্রয়োজন জাগরণের। অশ্রুর ভাষায় পঠিত এই ইতিহাসকে চেতনা সমুজ্জল দরসে পরিণত করা উচিত। বাতিলের সাথে আপোস না করে আল্লাহ'র যমীনে আল্লাহ'র খেলাফত প্রতিষ্ঠার এই ঝুঁকিবহুল, বিস্বাদময় ইতিহাস মূলতঃ বিপ্লবের এক প্রতিবাদী চেতনা জন্মেরই দাবী রাখে।

কারবালার ঘটনার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র ভূমিকা ছিল নিঃসন্দেহে সঠিক ও সময়োচিত পদক্ষেপ। এ হৃদয় বিদারক ঘটনার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কেউ যদি এ কথা বলার অপপ্রয়াস চালায় যে, অন্ততঃ আংশিক হলেও হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র একরুখা মনোভাবকে দায়ী করা যেতে পারে। কেননা তিনি এমন নাছুর বান্দা না হয়ে সযত্নে এড়িয়ে যেতে পারতেন সবকিছু। তবে তা হবে চিন্তার ক্ষেত্রে তার নিষ্ক্রিয়তারই পরিচায়ক। বরং বলা যেতে পারে চিন্তার ক্ষেত্রে এক তরফা মনোবৃত্তি। আর অসুস্থ মস্তিষ্ক থেকেই এমন ভাবনার উদ্ভব ঘটা সম্ভব। কারণ হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র বিভিন্ন ভাষণে এবং সুস্থ মানসিকতা নিয়ে ইতিহাসের সঠিক ও নিরপেক্ষ বিচার বিশ্লেষণে এ কথাই প্রমাণ হয় যে, এ ক্ষেত্রে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র সিদ্ধান্তই ছিল সম্পূর্ণ সঠিক ও নির্ভুল।

নানাজী হযরত রাসূলে খোদা 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামে'র রেখে যাওয়া দ্বীনকে অবিকৃত অবস্থায় কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়ার বুকে টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে, খেলাফতের মাসনাদকে কন্টকমুক্ত রাখার আশা বুকে নিয়ে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' আত্মত্যাগের যে নযীর স্থাপন করলেন, তা পরবর্তী উম্মতে মুহাম্মদীকে সত্যের পথে অবিচল থাকার প্রেরণা যুগাবে। কারবালা

যুগে যুগে পৃথিবীতে আল্লাহ'র রাজত্ব কায়েমের জিহাদে এ পথের সৈনিকদের দৃঢ় মনোবল নিয়ে, অকুতভয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার সাহস ও মদদ যুগাবে।

তাই তো দেখা যায়, এ ঘটনার সামান্য কয়েক বছর পরই বাতিল শক্তির অপশাসনের অবসান ঘটে কায়েম হয়েছিল ইনসাফ ভিত্তিক ইসলামী রাষ্ট্র। হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পূর্ণাঙ্গ খেলাফত। এই সোনালী যুগে 'বাঘে-ছাগে' এক ঘাটে পানি পান করার জনশ্রুতিও বিদ্যমান রয়েছে। পরবর্তীতেও সুদীর্ঘ সময় যাবৎ ইসলামী শাসনের সুফল মানুষ ভোগ করেছে। মুসলিম শাসকগণ খেলাফতের মাসনাদে বসে নবীজীর রেখে যাওয়া আদর্শকেই বাস্তবায়নে সচেষ্ট ছিলেন। অনেকেই পূর্ণ সফলতার নাগাল পেয়েছেন। আবার অনেকেই এ খেলাফতকে পুরো না পারলেও আংশিক প্রতিষ্ঠায় নিজেকে ব্রতি রেখেছেন আজীবন।

এর পরবর্তী যুগেও এ সূত্রিতায় বিয়োগ ঘটেনি। পৃথিবীর যে কোন অঞ্চলে যে কোন সময় তাগুতিশক্তি মাথাচাড়া দেয়ার চেষ্টা করেছে, তখনই প্রতিরোধের অলংঘনীয় প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছে সে যুগের, সে অঞ্চলের, হুসাইনী সৈনিক। এ সূত্রিতায় কখনো ভাটা পড়েনি, পড়বেও না কোনদিন।

এই উপমহাদেশেও এ কায়দার ব্যতিক্রম ঘটেনি। বাতিলের অনিবার্য প্রতিরোধে এখানেও জন্ম নিয়েছে সত্যপথের অজস্র পথিক, অসংখ্য অকুতভয় নকীব। আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন সময় এখানেও পাঠিয়েছেন খেলাফত প্রতিষ্ঠার 'হুসাইনী সৈনিক'দের।

ভারতবর্ষ যখন বৃটিশ বেনিয়াদের সীমাহীন নির্যাতনে অতিষ্ট। সমাজ সংস্কৃতি আর তাহযীব তমদ্দুনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যখন লালিত হচ্ছিল 'সাদা চামড়া'র মন-মানসিকতা। লাঞ্চনাকর গোলামীর জিঞ্জিরে তারা যখন পেচিয়ে ধরেছিল এখানকার সরল সহজ মানুষগুলোকে। গৃহযুদ্ধের আবহাওয়াকে চাঙ্গা করে দিয়ে তারা যখন দু'মুঠ ভরে ফায়দা লুটতে ব্যস্ত। তখন আল্লাহ পাক এখানেও তাঁর রহমতের দৃষ্টি দিলেন। প্রেরণ করলেন হুসাইনী আদর্শের সোচ্চার সৈনিক, বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের অগ্নি পুরুষ শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান (রহঃ) কে। যিনি 'তাহরীকে খেলাফত'-এর নামে

তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুলে বৃটিশ শ্বেত-ভল্লুকদের করেছেন বিতাড়িত; অন্যের পাতে হাত দেয়ার সাধ বুঝিয়ে দিয়েছেন তাদের হাড়ে হাড়ে।

প্রসংগতঃ উল্লেখ্য, বৃটিশ খেদাও আন্দোলনের অবিস্মরণীয় বিপ্লবী নেতা, মাল্টার জেলে বন্দী জীবন পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে দেশে প্রত্যাবর্তণ করলে, তাঁকে এক নজর দেখার বাসনা নিয়ে, তাঁর পবিত্র হাতের সামান্য পরশ লাভের দুর্বার আকাংখা বুকে বেঁধে ভীর জমিয়েছিল অসংখ্য, অগণিত মুক্তিকামী মানুষ। কিছুদিন পূর্বেও যিনি আমাদের অন্ধকার জগতে আলোর মশাল জ্বালিয়ে আমাদের অন্তরে আশা জাগিয়েছিলেন, ইনসাফ ভিত্তিক ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার, আমাদের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন শান্তি ও সমৃদ্ধির, সেই অলিকুল শিরমণি আমীরে শরীয়ত হযরত মাওলানা মুহাম্মাদুল্লাহ হাফেজ্জী হুযূর (রহঃ)-ও সেদিন সেই ভাগ্যবান অসংখ্য লোকের ভীরেই হাজির ছিলেন। সেই মহামনিষীকে দেখে তাঁর হাতে হাত মিলিয়ে ধন্য হয়ে ছিলেন।

তাঁর সতেজ হাতেই খেলাফত প্রতিষ্ঠার বিপ্লবী চেতনা বুকে নিয়ে তিনি বাংলার যমীনে পদার্পণ করেছিলেন। সেই চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে, বুকভরা আশা নিয়ে তিনি বাংলার যমীনে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন খোদার রাজত্ব। কায়েম করতে চেয়েছিলেন আল্লাহ'র যমীনে আল্লাহ'র খেলাফত। এ লক্ষ্য অর্জনের একাগ্র সাধনার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি তাঁর বার্ধ্যক্য জনিত ন্যুব্জতা। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি নিরলসভাবে চালিয়ে গেছেন বাংলার একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত তাঁর অব্যাহত সফর। ক্লান্তি যেমন তাঁকে কাবু করতে পারেনি, তেমনি পার্থিব কোন লোভ-লালসাও তাঁর সুদৃঢ় অবস্থান থেকে সামান্য টলাতে পারেনি। দিনরাত ছুটাছুটি করে মানুষের দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে তিনি বুঝানোর চেষ্টা করেছেন ইসলামী হুকুমতের সুফল। রাজনীতির খোলা চত্বরে তিনি সদম্ভে ঘোষণা দিয়েছিলেন প্রকাশ্য 'তাওবা'র।

তাঁর মিশনকে তিনি শুধু বাংলার যমীনেই সীমাবদ্ধ রাখেননি। দেশ থেকে দেশান্তরে, প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্যে, সুদূর লণ্ডন, ইরান, ইরাকসহ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও এ বিপ্লবের মন্ত্র তিনি বিস্তৃত করেছেন, এ আহবানের মহিরূহ তিনি রোপন করেছেন সেখানেও।

আমাদের পূর্বসূরীরা কারবালার শিক্ষার আদর্শে উদ্বুদ্ধ ও ঈমানী চেতনায় উদ্বেলিত হয়ে অবিরত সংগ্রাম চালিয়ে এসেছেন সেই পথ ধরে। তাঁদের পদাংক অনুসরণ করে আমাদেরকেও কারবালার মূল শিক্ষা ও পয়গামকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে হবে এবং তার আলো ঘুমন্ত মুসলমানদের ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দিতে হবে। যেন প্রতিটি মুসলিম পরিবার একটি 'ঈমানী দূর্গ' হিসেবে পরিণত হয়। এটাই হবে শুহাদায়ে কারবালার সঠিক মূল্যায়ন। তাতেই তাঁদের আত্মা পাবে শান্তি। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে কারবালার মর্মবাণী উপলব্ধি করার তাওফীক দান করুণ এবং সীরাতে-মুস্তাকীমের উপর মজবূত থেকে আজীবন বাতিলের বিরুদ্ধে লড়ে যাওয়ার জন্য কবূল করুন।

কারবালার ডাক

হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' সেদিন কারবালার ময়দানে আহলে বাইতসহ শাহাদাত বরণ করে যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেলেন। আগত মুসলিম উম্মাহর জন্য তাঁদের এই দৃষ্টান্ত একটি অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় আদর্শ হিসেবে আহ্বান থাকবে চিরকাল। এ আদর্শকে আকড়ে ধরে বাতিলের বিরুদ্ধে জীবনবাজী রেখে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়াই হবে আজকের মুসলমানদের প্রকৃত দায়িত্ব ও কর্তব্য। এটাই হবে কারবালার আহ্বানে সাড়া দেয়ার সঠিক পন্থা। প্রতি বছর আমাদের ত্যাগ ও তিতিক্ষার সুমহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে জীবন গড়ার ডাক দিয়ে যায় কারবালার হৃদয় বিদারক মর্মান্তিক ঘটনা।

হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র কারবালার ময়দানে আপোসহীন জিহাদের অর্থ এই নয় যে, আমরা মুহররম মাস আসলেই মাতম-মর্সিয়া, বিলাপ, তাজিয়া, আহাজারি, রুনাজারি করে তাঁর প্রতি দুঃখ-সমবেদনা প্রকাশ করব। হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' তো সেদিন মুসলিম উম্মাহ'কে ত্যাগ ও কুরবানীর শিক্ষা দিয়ে গেছেন। অন্য কিছু নয়।

তাই আজ আমাদেরকে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে সীমাহীন। নিজেদের সব কিছু কুরবানীর মাধ্যমে সাড়া দিতে হবে শতস্ফূর্তভাবে কারবালার ডাকের। ঘরে ঘরে গড়ে তুলতে হবে 'কারবালা বাহিনী'। ফেদায়ে কারবালার (কারবালার আদর্শ বাস্তবায়নে নিবেদিত সৈনিক) পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে সমাজের সর্বস্তরে। বাংলার ঘরে ঘরে 'কারবালা বাহিনী'র দূর্গ গড়ে তুলে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র জেহাদী জয্বা সৃষ্টি করতে হবে প্রতিটি মুসলমানের অন্তররাজ্যে।

অন্ধকারের কুহেলিকা থেকে জাতিকে সঠিক মুক্তির দ্বারে পৌছাতে পারলেই সফল হবে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র আপোসহীন সংগ্রাম। শান্তি পাবে শুহাদায়ে কারবালার জীবন্ত আত্মা। আজকের মুসলমাদের জন্য কারবালা এ আহ্বানই করে যায়। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে কারবালার ডাকে সর্বান্তকরণে সাড়া দেয়ার তাওফীক দিন।
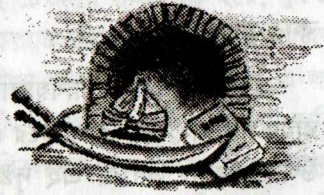
আমার দেখা কারবালা

১৯৮৩ সালে ইরান-ইরাকের ভ্রাতৃঘাতি যুদ্ধ বন্ধকল্পে 'শান্তি মিশন' নিয়ে হযরত হাফেজ্জী হুযূর (রহঃ) যখন মধ্যপ্রাচ্যে ছুটাছুটি করছিলেন এক অনন্য ব্যকুলতা নিয়ে। তখন সৌভাগ্যবশতঃ আমারও তাঁর সফর সঙ্গী হওয়ার নসীব ঘটে যায়। ইরান সফর শেষে সৌদিতে গিয়ে হজ্জব্রত পালনের পর আমরা যখন ইরাকের মাটিতে পা রাখি, তখন অপ্রত্যাশিতভাবেই একদিন সুযোগ এসে যায় হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র মাযার যিয়ারতের। কে ছাড়ে এমন সুবর্ণ সুযোগ!

দশই অক্টোবর আমাদের জন্য সেই সৌভাগ্যের দুয়ার উম্মোচিত হল। আমরা পা রাখলাম করবালার পথে। খোলামেলা, প্রশস্ত ও পরিচ্ছন্ন পথের দুপাশে দৃষ্টি সীমায় শুধু বালুকাময় বিজন মরুভূমির মায়া-মরিচিকার হাতছানি আমাদের চোখগুলোকে বার বার আকর্ষণ করছিল। কখনো-সখনো হঠাৎ ভ্রমনরত দু' একটি উটের কাফেলা দেখে আমরা হারিয়ে যাচ্ছিলাম কয়েক শতাব্দী পূর্বের সেই দিনগুলোতে। কিতাবে পড়া ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলো আমাদের চোখে ভাসতে থাকে। এখন তো কারবালা একটি জনবহুল, ব্যস্ত শহরের নাম। যার জাঁক-জমক পর্যটকদের তাক লাগিয়ে দিতে চায়। এখানে এসে এখন কারো মাথায় এমন চিন্তা ঠাঁই পাবে না যে, এই শহরটিই এক কালে ছিল একটি ধু-ধু মরুভূমি। যেখানে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' ও তাঁর সাথীদের তাজা রক্তে উত্তপ্ত বালুকণা একদিন ভিজে উঠেছিল এবং শাহাদাতের মর্মান্তিক ঘটনার পরিসমাপ্তি ঘটেছিল। কিন্তু 'নজফ' থেকে কারবালা পর্যন্ত পথে বালু আর কংকরের আধিপত্য দেখে এ কথা অনুমান করতে কষ্ট হয় না যে, এখানকার মাটি মুসাফিরদের কত ভয়ানক পরিস্থিতির মুখোমুখি করতে পারে।

হযরত হাফেজ্জী হুযূর (রহঃ)সহ আমরা গাড়ীতে করে যাচ্ছিলাম। এক স্থানে এসে ড্রাইভার হঠাৎ ব্রেক কসতেই আমার ধ্যান ভেঙ্গে গেল। ড্রাইভার বলল– 'এটাই কারবালার ময়দান, যেখানে ইয়াযীদ বাহিনী বড় নির্মমভাবে শহীদ করে ছিল হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'সহ তাঁর সাথী সঙ্গীদের।'

আমরা সকলে জুতা হাতে নিয়ে পায়ে হেটে সামনে অগ্রসর হতে লাগলাম। আমাদের চলার গতি মন্থর হয়ে এল। চোখের সামনে ভেসে উঠতে থাকল বার বার ইতিহাসের সেইসব রক্তাক্ত পৃষ্ঠাগুলো। একটি অমর শোকাবহ ও সতেজ ইতিহাসের বাস্তব পিঠস্থানে হাজির হওয়ায় মনটা চলে গেল সুদূর অতীতে।

সে কী এক করুণ দৃশ্য। যুদ্ধের ভয়াবহ পরিস্থিতিতে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' এক ফোটা পানির জন্য নিষ্ঠুর ইয়াযীদ বাহিনীর কাছে কতই না কাকুতি-মিনতি করেছিলেন। নিষ্পাপ শিশু-সন্তানদের জীবনটাকে বাঁচানোর জন্য আবেদন করেছিলেন তাদের কাছে। অন্যকিছু নয়, ফোরাতের

অসীম জলরাশি থেকে সামান্য পরিমাণ পানি আনতে দেয়ার সুযোগ চেয়েছিলেন। কিন্তু বাতিলের ঔদ্ধত্য ও জিঘাংসা মানবিক সেই প্রয়োজনের মুখেও, বেদনা ও কাতরতার সেই দুর্বিনীত সময়েও কোন রকম ছাড় দেয়নি। সত্যের প্রশ্নে অবিচল, খেলাফতের আমানত রক্ষার স্বার্থে দৃঢ়পদ এক যুগান্তকারী নকীব হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'কে শহীদ করেছে তারা নির্লজ্জ নিষ্ঠুরতায়। তাঁর শিশু-সন্তানদের বুকে পিঠে গলায় বিঁধিয়েছে তারা পাশবিকতার অজস্র তীর। তাঁর সঙ্গী-সাথী, সমর্থকদের বধ করেছে আকাশ-ভাঙ্গা এক ভয়াবহ নির্মমতায়।

এই ময়দানে শাহাদাত বরণের মধ্যদিয়ে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' পরবর্তী যুগের ইয়াযীদ বাহিনীকে হুঁশিয়ার করে গেছেন যে, তাগুতি শক্তি সংখ্যার দিক থেকে যত শক্তিশালীই হোক, সাময়িক ক্ষমতার জোড়ে বাতিল যত আষ্ফালনই করুক, সংখ্যালঘু নিরস্ত্র 'হক শক্তি'র হাতে তাদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। সেই পরাজয় ইতিহাসের ভাষায় হয় ঘৃণিত অধ্যায়। সময় সাপেক্ষে সেই পরাজয় সর্বকালেই কারো সমবেদনা অর্জনে ব্যর্থ হয়।

আমরা মন্থর গতিতে মাযারের দিকে অগ্রসর হতে থাকলাম। মাযারে পৌছে আমরা ফাতেহা শরীফ পাঠ করে মুনাজাত করি। সেখানে হযরত হাফেজ্জী হুযুর (রহঃ)-এর অবস্থা ছিল বর্ণনাতীত। যা শুধু অবলোকন করা যায়, হৃদয় দিয়ে অনুভব করা যায়। কলমের আঁচড়ে বা ভাষার পাণ্ডিত্বে তা ফুটিয়ে তোলা যায় না। মাযার যিয়ারতের সময় তাঁর দু' চোখ দিয়ে অঝোরে অশ্রু ঝরছিল, যিয়ারত শেষে তিনি আল্লাহ'র দরবারে যে মুনাজাত করেন, মুনাজাতের সেই সকরুণ ভাব জাগরণী আহাজারি আজও আমার কানে গুঞ্জরণ তুলছে। তাঁর মুনাজাতের ভাষা ছিল–

'হে রাব্বুল আলামীন! তোমার প্রিয় নবীর কলিজার টুকরা হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' এ ময়দানে দ্বীনের জন্য শাহাদাত বরণ করেছেন। খেলাফত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। তোমার পিয়ারা নবীর উম্মত হিসেবে, হুসাইনী আদর্শের পতাকা নিয়ে আমরাও বাংলার যমীনে খেলাফত প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ব্রতী হয়েছি এবং তার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করে যাচ্ছি। প্রভু হে! হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র কাংখিত খেলাফতকে তুমি বাংলার যমীনে প্রতিষ্ঠিত কর। আমাদের দেশীয় ইয়াযীদী শাসকদের স্বৈর-শাসনের বিরুদ্ধে মুকাবিলা করার হুসাইনী জয্‌বা তুমি আমাদের দান কর।'

(আজ হযরত হাফেজ্জী হুযূর (রহঃ) আমাদের মাঝে নেই। আছে তাঁর রেখে যাওয়া অগণিত হুসাইনী সৈনিক। তাদের কাঁধে বর্তিয়েছে বিরাট দায়িত্ব। তাদেরকেই এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে হুযূরের এই অসম্পূর্ণ কাজটিকে। হযরতের অন্তরের আকাঙ্ক্ষাকে বাংলার যমীনে বাস্তবে রূপদানের সার্বিক প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে তাদেরকেই।)

মুনাজাত শেষে মাযারের খাদেম আমাদেরকে আরও সামনে চর্তুদিক দেয়ালে পরিবেষ্টিত একটি স্থানের কাছে নিয়ে গেল। জায়গাটি দেখে মনে হল, এইমাত্র এখানে কাউকে হত্যা করা হয়েছে। যার তাজা রক্তের স্রোত এখনো প্রবাহিত হচ্ছে। খাদেমকে প্রশ্ন করে জানতে পেলাম, এটিই হল সেই স্থান, যেখানে যালিম ইয়াযীদ বাহিনী হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'কে শাহীদ করেছিল। হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র সেই স্মৃতিকে সংরক্ষণ করার জন্য এই কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করা হয়েছে।

খাদেমকে প্রশ্ন করলাম– 'ইতিহাসের সঠিক বর্ণনায় আমরা এতটুকুই জানতে পারি যে,হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র লাশকে ছিন্নভিন্ন করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছিল ইয়াযীদ বাহিনী। তাই যদি সত্যি হয়, তবে এখানে তাঁর মাযার হল কি করে?'

উত্তরে খাদেম বললেন– 'কারবালার ময়দান থেকে হযরত হুসইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র টুকরা হাড্ডি এবং গোশতগুলো একত্রিত করে এখানে তা দাফন করা হয়েছিল। তার উপরই মাযারের অবস্থান।'

সেদিন যদি হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' ঝুঁকি না নিয়ে ইয়াযীদের প্রস্তাব গ্রহণ করে আপোস মীমাংসার পথ বেছে নিতেন। বজ্র কঠিন

পদক্ষেপের পথ এড়িয়ে তিনি যদি সামান্যতম নমনীয় ভাব প্রদর্শন করতেন। তবে হয়ত ইয়াযীদ হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'কে তার মাথায় স্থান দিতে কসুর করত না এবং হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'রও ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের কোন অভাব হত না। কিন্তু তিনি এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের ভোগ-বিলাস, মায়া-মমতা পরিত্যাগ করে অনন্ত জীবনের শান্তি-সুখের প্রত্যাশায় এবং অনাগত প্রজন্মের সামনে সর্বাবস্থায় আল্লাহ পাক প্রদর্শিত সত্যের পথে সুদৃঢ় থেকে বাতিলের বিরুদ্ধে মুকাবিলা করার অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেলেন।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে কারবালার সঠিক মর্মবাণী উপলব্ধি করার তাওফীক দিন। আদ্ল ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' যে ত্যাগ ও তিতিক্ষার সুমহান আদর্শের শিক্ষা দিয়ে গেছেন, আমাদের কর্মজীবনে তার যথাযথ প্রতিফলন ঘটান। আমীন।

আশুরা সম্পর্কিত মাসায়েল ঃ

মুহররম মাস আসলেই শরীয়ত সম্পর্কে অজ্ঞ, অথচ সব জান্তার ভাব জাহির করতে অভ্যস্ত এক শ্রেণীর লোকদের মাঝে রীতিমত সাড়া পড়ে যায়। এ মাসের দশ তারিখ অর্থাৎ আশুরা পর্যন্ত বিরামহীনভাবে চলতে থাকে তাদের কার্য ব্যস্ততা। হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র শাহাদাতকে কেন্দ্র করে এই সময় বেশ ঘটা করে বিচিত্রসব অনুষ্ঠানমালা পালনের মাধ্যমে দিনটিকে তারা উদ্‌যাপন করে থাকে। তাই এ সম্পর্কিত ইসলামী শরীয়তের সুস্পষ্ট বিধানগুলো পাঠক সমাজের সামনে তুলে ধরা হল—

আশুরার নিষিদ্ধ বিষয়াবলী ঃ

'মুহররমের দশ তারিখে তাজিয়া, পতাকা, দুলদুল কবর ইত্যাদির আকৃতি বানানো, সাজসজ্জা ও আরাম-আয়েশ ত্যাগ করা, গোস্ত জাতীয় খাবার থেকে বিরত থাকা, সব সময় বিষণ্ণ থাকা, তাজিয়া বানানোর কাজে অংশ গ্রহণ, উৎসাহ প্রদান করা, সেই কাজে ব্যবহারের জন্য জিনিসপত্র দেয়া, অর্থকড়ি দিয়ে সাহায্য করা, বুক চাপড়ানো, মর্সিয়া করা, কারবালার শাহাদাতের কাহিনী পড়া, পুঁথি পাঠ করা, আহাজারি করা, তাজিয়া, দুলদুল ইত্যাদির সামনে যে সব নযর-নিয়াজ রাখা হয়, যে নারিকেল ভাঙ্গা হয়, আশুরার রাতে যে হালুয়া তাজিয়ার সামনে পেশ করা হয়, পুণ্য ও বরকত মনে করে তা খাওয়া এবং বন্টন করা, আশুরার রাতে তাজিয়া, দুলদুল, পতাকা ইত্যাদি নিয়ে প্রদক্ষিণ করা, গান-বাজনাসহ তা প্রদর্শন করা, আশুরার সকালে তাজিয়া, দুলদুল, পতাকা ইত্যাদি নিয়ে জাঁকজমকের সাথে মিছিল করা, সাথে যাওয়া এবং সে গুলোকে দাফন করা ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে 'বিদ্‌আতে সাইয়্যিয়াহ।' তার মাঝে কিছু কিছু এমন কাজও রয়েছে যে গুলো হারামের অর্ন্তভুক্ত। আর কিছু তো শির্কের সম্ভবনাও রাখে। অতএব এ সকল কর্মকান্ড পরিত্যাগ করা ওয়াজিব।

অবশ্য কারবালার ঘটনা এবং আহলে বাইতের শাহাদতকে স্মরণ করে দুঃখিত, ব্যথিত হওয়া ঈমানেরই অংশ। তবে তাকে শুধুমাত্র মুহররমের দশ

তারিখের মাঝে সীমাবদ্ধ করা নিতান্ত নির্বুদ্ধিতারই শামিল। এ তো এমন এক মর্মস্পর্ষী ঘটনা যা মুসলমানদের অন্তরে সার্বক্ষণিক জাগ্রত থাকবে।'(১)

'তাজিয়া বানানো যে নাজায়েজ এবং দ্বীন ও ঈমান বিরোধী তা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। একজন সাধারণ মুসলমানের সামনেও এ কথার দলীল পেশ করার কোন প্রয়োজন নেই। পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে–'তোমরা কি এমন জিনিষের উপাসনা করছ, যাকে তোমরা নিজেরাই বানিয়েছ?'

বলা বাহুল্য যে, মানুষই নিজের হাতে বাঁশ কেটে তাজিয়া তৈরী করে, আবার তার নামে মান্নত মানে, তার কাছে প্রার্থনা করে, সন্তান-সন্ততি ও স্বাস্থ্যের জন্য দোয়া করে, তার যিয়ারতকে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র যিয়ারত মনে করে, এসকল কাজ কি ঈমানের সারমর্ম এবং ইসলামী শিক্ষার সাথে সুস্পষ্ট সাংঘর্ষিক নয়?' (২)

'কেউ কেউ প্রশ্ন করে থাকেন যে তাজিয়া তো একটি আকৃতি। যদি বায়তুল্লাহ শরীফ, মদীনা মুনাওয়ারা, রওযায়ে আতহার, বায়তুল মুকাদ্দাস ইত্যাদির ফটো তোলা বা রাখা জায়েজ হয়, তবে কেন তাজিয়া বানানো জায়েজ হবে না?

তাদের এই প্রশ্নের উত্তর হল— 'নিষ্প্রাণ ফটো, নকশা ইত্যাদি তোলা এবং রাখা তখনই জায়েজ হয়, যখন তার দ্বারা কোন ইবাদাত-বন্দেগী এবং সম্মানের উদ্দেশ্য না হয়। কাবা শরীফ ইত্যাদির ফটো-নকশা তো ইবাদাত বন্দেগীর জন্য রাখা হয় না, এগুলোর তাওয়াফও করা হয় না। এগুলোর উদ্দেশ্যে কেহ মান্নত বা নযর-নিয়াজও করে না। এমন কি আসল কাবার ন্যায় এগুলোর সম্মানও করা হয় না। অথচ তাজিয়ার মিছিল ও তাজিয়া বানানোর মাঝে আকীদা এবং বিশ্বাসগত চূড়ান্ত বিভ্রান্তি রয়েছে। কেননা তাজিয়ার সম্মানে সিজদা করা হয়, তাকে প্রদক্ষিণ করা হয়, বিভিন্ন ধরনের উপহার-উপঢৌকন পেশ করা হয়, তার নামে মান্নত মানা হয়, তার কাছে নিজেদের উদ্দেশ্য পূরণের আরজি পেশ করা হয়। এজন্য তাজিয়া বানানো এবং তা ঘরের ভিতর টানানো নাজায়েজ। যদি বায়তুল্লাহর ফটোর সাথেও অনুরূপ আচরণ করা হয়, তাহলে তাও নাজায়েজ হবে, এতে কোন সন্দেহ নেই।' (৩)

---

(১) ইমদাদুল মুফতিয়ীন, খন্ড - ১, পৃষ্ঠা - ৫৯-৬০
(২) ফাতাওয়ায়ে রহীমিয়া , খন্ড - ২, পৃষ্ঠা - ২৭৪-২৭৫
(৩) ফাতাওয়ায়ে রহীমিয়া - খন্ড : ২, পৃষ্ঠা - ২৭৬-২৭৭

শিয়া সম্প্রদায়ের ভ্রান্ত বিশ্বাস ঃ

'শিয়া সম্প্রদায় মুহররম মাসকে অমঙ্গলের মাস মনে করে। তাদের মতে 'শাহাদাত' অত্যন্ত খারাপ জিনিস এবং অমঙ্গলের বিষয়। যেহেতু হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' এ মাসেই শহীদ হয়েছিলেন, এ জন্য মুহররম মাসে শিয়ারা কোন আনন্দোৎসব, খুশীর কাজ, বিবাহ-শাদী ইত্যাদিতে অংশ গ্রহণ থেকে বিরত থাকে। মুসলমানদের আক্বীদা শিয়াদের সম্পূর্ণ বিপরীত। ইসলামের দৃষ্টিতে এ মাস সম্মানীত এবং ফযীলতপূর্ণ। মুহররম শব্দের অর্থই সম্মানীত, মর্যাদা সম্পন্ন এবং পবিত্র।' (১)

মুহররম মাসে ইছালে ছওয়াবের উদ্দেশ্যে খাওয়ার আয়োজন করা ঃ

'মুহররম মাসে বিশেষ করে নয়, দশ এবং এগার তারিখে খানা পাকিয়ে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র আত্মার উদ্দেশ্যে ইছালে ছওয়াব করা হয়, যা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারনা। ইছালে ছওয়াবের সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি হল, নিজের সাধ্যানুযায়ী নগদ টাকা পয়সা কোন উত্তম কাজে লাগিয়ে দেয়া বা কোন ফকির-মিসকীনকে দান করে দেয়া। কারণ পয়সার মাধ্যমে গরীব-মিসকীন স্বীয় প্রয়োজন মিটাতে সক্ষম হয়, এবং টাকা পয়সা যদি গরীবের ঐ দিন প্রয়োজন না হয়, তবে পরবর্তী সময়ের জন্য সে তা রেখে দিয়ে তার প্রয়োজন মিটাতে পারে। তাছাড়া এতে রিয়া বা লোক দেখানো থেকেও মুক্ত থাকা যায়। যখন একথা প্রমাণিত হল যে, মুহররম মাস এবং আশুরার দিনটি ফযীলতপূর্ণ, তাই এ মাসে অধিক পরিমাণে নেক কাজ করা উচিত। সুতরাং এ মাসে বিবাহ-শাদী আনন্দোৎসবে অংশ গ্রহণ কোন অশুভ কাজ নয়। বরং এ মাসে বিবাহ-শাদীতে বরকত রয়েছে।'

নিম্নে ইছালে ছওয়াবের ক্ষেত্রে প্রচলিত কর্মপদ্ধতির দোষনীয় দু'য়েকটি দিক তুলে ধরা হল —

(১) যে সমস্ত আত্মার জন্য ইছালে ছওয়াব করা হয়ে থাকে, যদি ইছালে ছওয়াবের মাধ্যমে ঐ আত্মার কাছে লাভ লোকসানের আশা করা হয়, তবে তা শির্কের অর্ন্তভুক্ত হবে।

(২) সাধারণতঃ মনে করা হয় যে, যে জিনিসটি সদক্বা হিসাবে প্রদান করা হয়, মৃতব্যক্তি হুবহু ঐ জিনিসটিই পেয়ে থাকে। এ ধরনের ধারণা সম্পূর্ণ ভুল এবং মিথ্যা। মৃতব্যক্তি ঐ জিনিসটি প্রাপ্ত হয় না বরং এর ছওয়াব পেয়ে থাকে।

---

(১) আহসানুল ফাতাওয়া, খন্ড - ১, পৃষ্ঠা - ৩৮৯

(৩) ইছালে ছওয়াবের সময় নিজের পক্ষ থেকে কিছু শর্ত জুড়ে দেয়া হয়, যেমন — নির্দিষ্ট মাস, দিন, খাদ্য ইত্যাদি; অথচ শরীয়ত এ সকল বিষয় নির্দিষ্ট করেনি। যখন যা ইচ্ছা তখন তা দান করার অনুমতি রয়েছে। শরীয়তের দেয়া স্বাধীনতাকে নিজের পক্ষ থেকে শর্তযুক্ত করা শক্ত গোনাহ এবং বিদআত। বরং তা শরীয়ত বিরুদ্ধ কাজ।' (১)

ইসলামে শোক পালনের বিধান ঃ

মুহররম মাসকে মাতম এবং শোকের মাস মনে করা নাজায়েজ এবং হারাম। হাদীস শরীফে মহিলাদের তার আত্মীয় স্বজনের মৃত্যুতে তিনদিন শোক পালন করার অনুমতি দিয়েছে। আর নিজের স্বামীর ইন্তেকালে শোক পালন করার বিধান দিয়েছে চারমাস দশদিন। অন্য কারো মৃত্যুতে তিন দিনের অধিক শোক পালন বৈধ নেই। বরং তা করা হারাম। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম'-এর সুস্পষ্ট ঘোষণা হল —

'যে নারী আল্লাহ তায়ালা এবং কিয়ামত দিবসে বিশ্বাসী, তার জন্য জায়েজ নেই যে, কারও মৃত্যুতে তিন রাতের বেশী শোক পালন করে। কিন্তু স্বামীরা এই নির্দেশের অর্ন্তভুক্ত নয়। কেননা তাদের বেলায় শোক পালন করতে হবে চারমাস দশদিন।' (বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, মিশকাত শরীফ)

মুহররম মাসে বিবাহ-শাদীকে অশুভ মনে করা শক্ত গুনাহ এবং 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত'-এর আক্বীদার সম্পূর্ণ পরিপন্থি। ইসলাম যে সব বিষয়কে হালাল এবং জায়েজ আখ্যা দিয়েছে, বিশ্বাস এবং কার্যক্ষেত্রে সে সব বিষয়কে নাজায়েজ এবং হারাম মনে করলে ঈমানহারা হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। মুসলমানদের উচিত, শিয়া সম্প্রদায় এবং রাফেজীদের ভ্রান্ত বিশ্বাস ও কার্যক্রম থেকে সম্পূর্ণরূপে বেঁচে থাকা।' (২)

আশুরা সম্পর্কে মনিষীদের অভিমত ঃ

বড়পীর হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) আশুরা সম্পর্কে স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন —

'হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র শাহাদাতের দিনটিকে যদি মাতম বা শোক দিবসের জন্য এতই গুরুত্ব দেয়া হত, তবে সোমবার দিনটিকে আরও ঘটা করে শোক দিবস হিসেবে পালন করা অধিক বাঞ্চনীয় ছিল। কারণ, এ

(১) আহ্‌সানুল ফাতাওয়া, খন্ড-১, পৃষ্ঠা - ৩৯১-৩৯২

(২) ফাতাওয়ায়ে রহীমিয়া, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৯১

দিনে রাসূলে আরাবী, আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' সব ত্যাগ করে আল্লাহ তায়ালার দিদারে চলে গিয়েছেন। এই দিনেই নবীর পর শ্রেষ্ঠমানব প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর ছিদ্দীক 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' পরপারে পাড়ি জমিয়েছেন।' [অথচ আমাদের সমাজে সোমবারকে শোক দিবস হিসেবে পালন করার নিয়ম তো আজ পর্যন্ত চালু হয়নি। তাহলে কোন যুক্তির আশ্রয় নিয়ে ঐ শ্রেণীর লোকেরা হযরত হুসাইন রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু'র শাহাদত নিয়ে এত বাড়াবাড়ি করছে? তা আমাদের বোধগম্য নয়।] (গুনিয়াতুত্ তালেবীন, খন্ড- ২, পৃষ্ঠা - ৩৮)

'মুসলিম সমাজে এ ধরণের কু-প্রথা চালু হওয়ার আশংকা করেই বহু পূর্বে আল্লামা ইবনে হযর মক্কী (রহঃ) সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলে ছিলেন— 'হুশিয়ার!! আশুরার দিনে তোমরা রাফেজীদের বিদআতে জড়িয়ে যেও না। মাতম করা, উহ্-আহ্ করে চিৎকার করা, কিংবা শোকে-দুঃখে মুহ্যমান হওয়া তো মুসলমানের ঐতিহ্য নয়। এমন যদি হত, তবে তো খোদ রাসূলুল্লাহ 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম'-এর মৃত্যু দিবসে এই কর্মকান্ডকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হত।' (সাওয়ায়েকে মুহ্‌রিকা, পৃষ্ঠা - ১১২)

এ সম্পর্কে আল্লামা রুমী (রহঃ) অভিমত ব্যক্ত করে বলেন— 'হযরত হুসাইন ইবনে আলী 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র শাহাদাতের কারণে রাফেজীদের মত এ দিনটিকে মাতমের জন্য নির্দিষ্ট করে নেয়া, বস্তুত: দুনিয়ায় নিজেদের পুণ্যময় সকল কাজের বিনাশ করারই নামান্তর হবে। তা ছাড়া আর কিই বা আশা করা যায়? অথচ এ কাজের কর্তারা নিজেদের সৌভাগ্যবান মনে করে গর্বে বুক উচিয়ে চলে। মানুষের কাছে এ কাজের ফিরিস্তি গেয়ে তারা সীমাহীন সুখ অনুভব করে। কিন্তু তারা কি একটি বারের তরে চিন্তা করে দেখার প্রয়োজন বোধ করে না যে, খোদ আল্লাহ তায়ালা কিংবা তার রাসূল 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' কোন নবী রাসূলের মহা বিপদের দিন বা মৃত্যুর দিন হিসেবে মাতম বা শোক পালনের নির্দেশ কখনো কাউকে দেননি।'(১) (মাজালিসে আবরার, পৃষ্ঠা-২৩৯।)

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) অভিমত ব্যক্ত করে বলেন— 'মুহররমের দশ তারিখ পবিত্র কুরআনকে খুব সুন্দরভাবে সাজিয়ে পুস্পস্তবক অর্পণ করা এবং তা মাথায় চড়িয়ে অলিতে গলিতে প্রদর্শন

(১) ফাতাওয়ায়ে রহীমিয়া, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৪১-৩৪২

করা, তার নিচে গিয়ে মাথা লাগানো, চুমা খাওয়া, ঘটা করে ডাকঢোল পেটানো এবং এগুলোকে বড় পুণ্যের কাজ মনে করা; শরীয়তে এর কোন সনদ নেই। এ গুলো একেবারেই ভিত্তিহীন কাজ। এর দ্বারা সাওয়াবের আশা করা একেবারে বৃথা।' (১)

হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহঃ) নিজের অভিমত ব্যক্ত করে বলেন — 'অনেক নির্বোধ বোকা টাইপের মানুষ মুহররমের দশ তারিখে বিবাহ-শাদী, সুন্নাতে খাৎনা এবং অন্যান্য আনন্দোৎসব বর্জন করে থাকে, অথচ শরীয়তে এ সব কিছু জায়েজ আছে। না জায়েজ হওয়ার পক্ষে কোন তথ্য প্রমাণ আমাদের কাছে নেই। বাকী শুহাদায়ে কারবালার হৃদয় বিদারক ঘটনা মুসলমানের অন্তরকে সবসময় ব্যথিত করবে, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। শুধুমাত্র দশই মুহররমকে শোকের জন্য বেছে নেয়া বোকামী বৈ কিছু নয়। ইসলামী শরীয়তে শোক পালনের জন্য বিধিবদ্ধ যে নিয়ম করে দিয়েছে, শোক পালনের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র তাই বৈধ পন্থা মনে করতে হবে। অন্য সব কিছু নাজায়েজ মনে করতে হবে।

অতএব বিবাহ-শাদী, অলিমা, সুন্নাতে খাৎনা, সব রকমের বৈধ আনন্দোৎসব মুহররম মাসে বিশেষতঃ দশই মুহররম জায়েজ আছে।' (২)

সমাপ্ত

(১) ইমদাদুল ফাতাওয়া, খন্ড- ৫, পৃষ্ঠা - ৩৪৮, পরিশিষ্ট ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৩২০

(২) ইমদাদুল মুফতিয়ীন, খন্ড- ১, পৃষ্ঠা - ৯৬
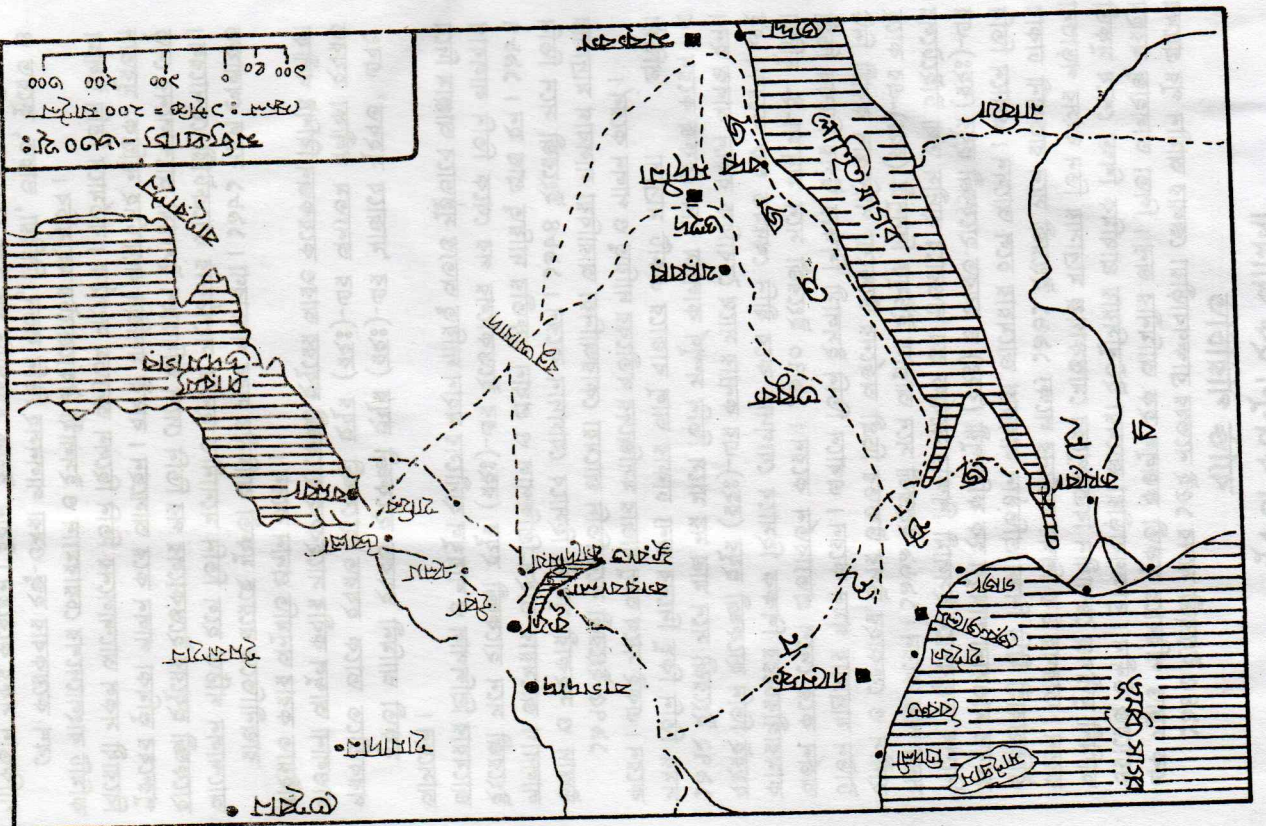
মুফতী ফজলুল হক আমিনী

ব্যক্তি পরিচিতি

১৯৪৫ ইংরেজী সনের ১৫ই নভেম্বর ব্রাক্ষণবাড়ীয়া জেলার আমীন পুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে মুফতী ফজলুল হক আমিনীর জন্ম। পিতা আলহাজ্ব মরহুম ওয়ায়েজ উদ্দীন। ব্রাক্ষণবাড়ীয়া জামেয়া ইউনুসিয়ায় প্রাথমিক শিক্ষা শেষে মুফতী আমিনী মুন্সীগঞ্জ জেলাধীন বিক্রমপুরের মোস্তফাগঞ্জ মাদ্রাসায় তিন বৎসর পড়াশুনা করেন। তারপর উচ্চ শিক্ষা অর্জনের লক্ষ্যে ১৯৬১ ইংরেজী সনে রাজধানী ঢাকার ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান লালবাগ জামেয়ায় চলে আসেন। এখানে তিনি হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) ও হযরত হাফেজ্জী হুযূর (রহঃ)-এর বিশেষ তত্ত্বাবধানে ইসলামী শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তর দাওরায়ে হাদীস তথা টাইটেলের সনদ লাভ করেন। ১৯৬৯ ইংরেজী সনে আল্লামা ইউসুফ বিনুনুরী (রহঃ)-এর কাছে হাদীস ও ফেকাহ্‌র উপর উচ্চতর ডিগ্রী অর্জনের উদ্দেশ্যে পাকিস্তান করাচী নিউ টাউন মাদ্রাসায় গমন করেন। এখানে তিনি ইসলামী শিক্ষার উপর বিশেষ ডিগ্রী অর্জন করে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৯৭০ ইংরেজী সনে মাদ্রাসা-ই- নূরিয়া কামরাঙ্গীরচরের শিক্ষক হিসাবে যোগদান করে দ্বীনি খেদমত শুরু করেন। এই বছরই তিনি হাফেজ্জী হুযূর (রহঃ)-এর কন্যার সাথে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হন। ১৯৭২ ইংরেজী সনে মাত্র নয় মাসে তিনি সম্পূর্ণ কালামে পাক হেফজ করেন। এ সময় তিনি কিছু দিনের জন্য ঢাকার আলু বাজারে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। একই সাথে আলু বাজার মসজিদের খতীবের দায়িত্ব ও পালন করেন।

১৯৭৫ ইংরেজী সনে তিনি জামেয়া কোরআনিয়া আরাবিয়া লালবাগ মাদ্রাসার উস্তাদ ও সহকারী মুফতী হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৮৪ ইংরেজী সনে তিনি লালবাগ জামেয়ার ভাইস-প্রিন্সিপাল ও প্রধান মুফতীর দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। ১৯৮৭ ইংরেজী সনে হাফেজ্জী হযূর (রহঃ)-এর ইন্তেকালের পর থেকে তিনি লালবাগ জামেয়ার প্রিন্সিপাল ও শায়খুল হাদীসের মহান দায়িত্ব অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে আঞ্জাম দিয়ে আসছেন।

মুফতী আমিনী হযরত হাফেজ্জী হুযূর (রহঃ)-এর 'মাজাযে সুহবত' এবং পরবর্তীতে তাকে হযরত হাফেজ্জী হুযূর (রহঃ)-এর অন্যতম খলীফা হযরত মাওলানা আব্দুল কবীর সাহেবসহ হাফেজ্জী হুযূরের আরও কয়েকজন বিশিষ্ট খলীফা বাইয়াত করার অনুমতি প্রদান করেন।

রাজনীতিতে রয়েছে মুফতী আমিনীর সরব পদচারণা। ১৯৮১ সালে খেলাফত আন্দোলন গঠিত হলে তিনি মনোনীত হন এ সংগঠনের সেক্রেটারী জেনারেল। হাফেজ্জী হুযূরের ইন্তেকালের পর তিনি দেশে অধিকাংশ ইসলামী আন্দোলনের নেতৃ পুরুষের ভূমিকা পালন করে আসছেন। বাবরী মসজিদ লংমার্চসহ নাস্তিক- মুরতাদ বিরোধী সকল আন্দোলনের তিনি ছিলেন অন্যতম সংগঠক। বর্তমানে তিনি উলামা কমিটি বাংলাদেশের চেয়ারম্যান ও ইসলামী ঐক্যজোটের মহাসচিব।

বেশ কয়েকবার হজ্ব-ওমরা পালনসহ তিনি লন্ডন, সিরিয়া, ভারত, কুয়েত ও পাকিস্তান সফর করেছেন। ইরান, ইরাক ভ্রাতৃঘাতি যুদ্ধ বন্ধে ১৯৮৪ ইংরেজী সনে তিনি হযরত হাফেজ্জী হুযূরের শান্তি মিশনের অন্যতম সদস্য ছিলেন।